গীতা কথা

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন পদে যুগল প্রণাম।
কৃপাবলে প্রবেশিব গীতাজ্ঞান ধাম॥

শ্রীমৎ শ্রী১০৮ শ্রীযোগেশানন্দ সরস্বতী

প্রকাশক—
সত্যেন্দ্রনাথ পালিত
বাগবাজার, চন্দননগর

প্রথম সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থান
মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা—১২

প্রিণ্টার—
শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র ঘোষ,
শ্রীলক্ষ্মী প্রেস,
৮১, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

উপনিষদ্-রূপ গাভীসমূহের অমৃতদুগ্ধ—এই গীতা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পার্থরূপ বৎসকে উপলক্ষ করিয়া সুধীজনের ভোগের জন্য এই দুগ্ধ দোহন করিয়াছেন।

উপনিষদ্‌সমূহ বেদের অন্তর্গত। ধর্ম বিষয়ে বেদই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কারণ বেদ অপৌরুষেয়, অর্থাৎ কোনও মনুষ্য রচিত নহে। ঋষিরা বেদ রচনা করেন নাই। সমাধিযোগে তাঁহারা ভগবানের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, এইজন্য বেদের অপর নাম শ্রুতি। এই বাণী শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বেদের অর্থ অতি দুরূহ। সেই জন্য সহজভাবে বেদ বুঝাইবার জন্য ঋষিরা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত।

উপ (নিকটে)-নি (নিশ্চিতভাবে)—সদ্ (পাওয়া)+ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া উপনিষদ্ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। গুরুর নিকটে শিষ্য যে উপায়ে নিশ্চিতভাবে ভগবানকে পাইতে পারে, তাহাই উপনিষদে দেওয়া আছে। ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা বা যোগবিদ্যা। গীতার প্রত্যেকটি অধ্যায়ই যোগ নামে অভিহিত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে "উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে ইত্যাদি" কথাগুলি দেখিতে পাই। অতএব গীতায় বেদ বা উপনিষদ্ নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা বা যোগবিদ্যা উপদিষ্ট আছে।

বেদের পূর্ব্বভাগ বা কর্ম্মকাণ্ড যজ্ঞকর্ম্ম করিবার উপদেশ দিতেছেন। উপনিষদ বেদের অন্তভাগ বা বেদান্ত। ইহাই বেদের জ্ঞানকাণ্ড। যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং তখন জ্ঞানকাণ্ডের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার জন্মে। এই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়। এই জানা মানে প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা দর্শন। পুস্তক পাঠে বা উপদেশ শ্রবণে প্রত্যক্ষ অনুভূতি সম্ভবপর নহে। যোগ সাধনার প্রযোজন। যোগ সাধনায় গুরু অপরিহার্য্য। সমাধি যোগে যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তিনিই গুরুপদবাচ্য, কারণ তাহার দ্বারাই শিষ্যে শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। চিত্ত শুদ্ধ হইলে গুরু আপনি আসিয়া উপস্থিত হন। গুরুর নিকটে ব্রহ্মসম্বন্ধে **শ্রবণ** করিতে হয় এবং তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী **মনন** (চিন্তা) ও **নিদিধ্যাসন** (ধ্যান) করিতে হয়। ইহার ফলে সমাধি যোগে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় বা ব্রহ্মের জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানে সকল সময়ে প্রতিষ্ঠিত থাকাকেই ভক্তি বলে।

বেদের কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড পরস্পর সংশ্লিষ্ট। কিন্তু ইহাদিগকে বিশ্লিষ্ট করিয়া আমাদের দেশে দুইটি মত বা পথের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহকালে অভিষ্টানুযায়ী ফললাভের আকাঙ্খায় এবং পরকালে স্বর্গ প্রাপ্তির আশায় একদল কর্ম্মকাণ্ডকেই বেদের সারবস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপর দল বেদের জ্ঞানকাণ্ড মাত্র অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন যে কর্ম্মমাত্রেই বন্ধনের কারণ অতএব সকল প্রকার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণই শ্রেয়। একদিকে ফলাকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ কর্ম্ম যেমন ক্রমশঃ কামকামনা বাড়াইয়া দুঃখের কারণ হইতে লাগিল—অপরদিকে তেমনি সকল কর্ম্ম ত্যাগ দিয়া সন্ন্যাসীগণ জীবিকার দুর্নিবোধ্য তাড়নায় পরমুখাপেক্ষী হইতে লাগিলেন। জ্ঞান ও কর্ম্মের অদ্ভুত সমন্বয় করিয়া গীতা বলিতেছেন যে কর্ম্ম ও জ্ঞান

নিরপেক্ষভাবে থাকিতে পারে না, অঙ্গাঙ্গীভাবেই থাকে। অহং বুদ্ধিই ভোগের পথে প্রলুব্ধ করিয়া ভোগাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ কর্ম্মদ্বারা বন্ধন ঘটায় এবং এই অহংবুদ্ধিই আত্মজ্ঞানের আবরণ স্বরূপ। যিনি দেহরূপ রাষ্ট্রকে ধরিয়া আছেন সেই অহমিকাই ধৃতরাষ্ট্র। আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে অন্ধ হওয়ায় তিনি দুর্য্যোধন (যাহার সহিত যুদ্ধ করা দুষ্কর), দুঃশাসন (যাহাকে শাসন করা দুরূহ)—অর্থাৎ কাম, ক্রোধ প্রভৃতির জন্মদাতা। কুরুক্ষেত্র বা কর্ম্মক্ষেত্ররূপ জীবনে এই ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গীতা যোগযুক্ত হইবার উপদেশ দিতেছেন।

কিন্তু বিষাদ না আসিলে যোগযুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগে না। এই জন্য গীতার প্রথম অধ্যায়ই বিষাদ যোগ। গীতায় ৭।১৫-১৮ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন যে চারি প্রকার লোক তাঁহার ভজনা করে—আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী এবং তন্মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। প্রথমেই নাম করিলেন আর্ত্তের। আর্ত্ত হইয়া বিষাদে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলে তবেই ভগবানের শরণাপন্ন হয়। যদিও সে তখনও ভগবানকে জানে না, তবুও তার ঐকান্তিকতা থাকায় ভগবান তার দুঃখ দূর করেন। পরে প্রয়োজন বোধে (অর্থার্থী হইয়া) আবার ডাকে, এবং ক্রমে ভগবান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়। পরিশেষে যখন প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা ভগবানকে জানিতে পারে, তখন সে জ্ঞানী হয়। এই জ্ঞানীই যোগী এবং প্রকৃত ভক্ত।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগীবিদ্যা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। নিত্যানিত্যবিবেক বা সদসৎ নির্ণয় দ্বারা যোগের সূচনা করিতে হইবে। প্রকৃতিতে সমস্ত বস্তুই অনিত্য বা অসৎ। আত্মা বা ভগবানই একমাত্র নিত্য বা সৎ বস্তু। সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই

তিন গুণ লইয়াই প্রকৃতি। এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই মহত্তত্ত্ব বা প্রজ্ঞা', এবং ইহাতেই প্রকৃতির প্রথম বিকাশ। এই বিকাশ বা সজীবতা আত্মার ঈক্ষণ বা সান্নিধ্য হেতুই হয়। আত্মার ঈক্ষণে প্রকৃতি চঞ্চল হইলে যে গুণক্ষোভ হয় তাহাতে আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তি উৎপন্ন হইয়া পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ) ও তাহাদের উপযোগী পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) সৃষ্ট হয় এবং পরে এই পঞ্চভূতের নানা প্রকার মিশ্রণে ক্রমশঃ জগতের যাবতীয় সৃষ্টি হয়। এই সৃষ্টির মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। যে গুণসাম্যাবস্থায় বা প্রজ্ঞায় আত্মার ঈক্ষণ বা সান্নিধ্য ঘটিয়াছিল, সেই অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্থিতিলাভ না করা পর্য্যন্ত সে তৃপ্ত হইতে পারে না। কি উপায়ে তাহা সম্ভবপর তাহা গীতা হইতে পাওয়া যায়।

সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিন গুণ যথাক্রমে অহংকার, বুদ্ধি ও মনের পরিপোষক। সত্ত্বগুণে শুদ্ধমাত্র আমিত্ব বোধ। রজোগুণে বুদ্ধি প্রবৃত্তিমুখী বা কামাত্মিকা হইয়া দুঃখের কারণ হয় এবং তমোগুণে মনের সংকল্প বিকল্প দ্বারা মোহ বা অজ্ঞানতার সৃষ্টি করে। রজঃ ও তমোগুণকে অবশ্য অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু ইহার পরে কেবল আমিত্ব বোধ লইয়া সত্ত্বগুণে থাকা অসম্ভব। হয় প্রবৃত্তিমুখী হইয়া আবার রজোগুণে নামিতে হইবে, নয় তো এই আমিত্বের একটা অবলম্বন বা আশ্রয় দরকার। এই আমিত্বের অবলম্বন যে চেতনতা বা চিৎসত্ত্বা—যাহা আছে বলিয়া আমার এই আমি আছে ও স্পন্দিত হইতেছে—তাহাকে জানিতে হইবে এবং এই জ্ঞানে সম্যকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

বুদ্ধির দুইটি মুখ—একটি বহির্মুখ এবং অপরটি অন্তর্মুখ।

বহির্মুখটি কামাত্মিকা এবং ইহা পরে রাগাত্মিকা হইয়া ইন্দ্রিয়ের অধীনতা স্বীকার করে। এই কামের ক্ষেত্রকে কেবল ইন্দ্রিয়ের সংযম দ্বারা বশে আনা সম্ভবপর নয়। বুদ্ধির অন্তর্মুখটির সাহায্য লইতে হইবে। এই মুখটি নিশ্চয়াত্মিকা। ইহা বিচার দ্বারা নিশ্চয় করে—"আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম এবং কোথায় যাইব।" ইহার মুখটি "আমি"র দিকে—যে আমির মধ্যে আত্মা লুকায়িত। গীতার প্রথম ষটকের (১ হইতে ৬ অধ্যায়ের) সাধনা দ্বারা আমিত্ব শোধিত হইলে তাহার মধ্যে আত্মার স্ফুরণ হইবে। কর্ম্মের সাধনা দ্বারা আমিত্বের শোধন হইবে। লাভালাভ সমজ্ঞানে কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া কর্ত্তব্যবোধে নিষ্ঠার সহিত স্বভাবজ কর্ম্ম করিতে হইবে। এই বিশ্বই যাঁহার কর্ম্মস্বরূপ তিনিই আমার দ্বারা কৃত কর্ম্মের ফল নির্দ্ধারণ করিবেন জানিয়া কর্ম্মে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিতে হইবে। যোগারুরুক্ষু ব্যক্তির ইহাই সাধনা। ইহার ফলে অহংবুদ্ধির শোধন হইয়া ব্যষ্টিতে (নিজ মধ্যে) যে আত্মার স্ফুরণ হয় তাহাকেই অপরা সিদ্ধি বলে। যোগারুরুক্ষু মুনি তখন যোগারূঢ় হন।

কিন্তু এই ব্যষ্টিতে (নিজমধ্যে) যে আত্মার স্ফুরণ, ইহা সমুদ্রমধ্যে ঘটস্থিত বারিমাত্রের উপলব্ধি। এখনও ঘটের বাহিরে বিশাল সমুদ্রকে জানিতে বাকি রহিল। গীতার দ্বিতীয় ষটকের (৭ হইতে ১২ অধ্যায়ের) সাধনা দ্বারা ঘটমধ্যস্থ বারিকে বিশাল সমুদ্রের অংশরূপে জানিয়া সমষ্টিতে যে আত্মার উপলব্ধি হইবে তাহাই প্রকৃত আত্মদর্শন, এবং ইহাই যোগারূঢ়ের সাধনা। এই সাধনায় কৃষ্ণ (কর্ম্ম) ও শুক্ল (জ্ঞান) মার্গদ্বয় এবং বিভূতি সকলকে জানিবার পর বিশ্বরূপদর্শন অর্থাৎ সমাধি যোগে সমষ্টি আত্মার উপলব্ধি হইবে। সমাধি যোগে সাধক সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অব্যক্তাবস্থায় বা

প্রজ্ঞায় স্থিত হন অথবা স্থিতপ্রজ্ঞ হন এবং তখন তাঁহার মন, বুদ্ধি ও অহংকার বিলুপ্ত হইয়া চিত্ত নিরুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই সমাধি বা চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থা লাভ করা সহজ নয়, এবং লাভ করিলেও ইহার স্থায়িত্ব অধিকক্ষণ হয় না। সমাধি হইতে ব্যুত্থান হইলে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা গিয়া বৈষম্য ঘটে, কিন্তু সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হেতু সমাধিলব্ধ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভবপর হয়। এই অবস্থায় স্থিতধী (সমাধি হইতে বুত্থিত) মুনি বিশ্বজগতে সর্বত্রই ভগবৎসত্তা দেখিতে পান এবং নিজেকেও সেই ভগবৎসত্তার দ্বারা চালিত যন্ত্রস্বরূপ অনুভব করেন। এইরূপে তিনি ভক্তিযোগে গুণাতীত থাকেন। ইহাই পরাসিদ্ধি। তৃতীয় ষটক (১৩ হইতে ১৮ অধ্যায়) কে গীতার পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে।

নিঃশ্রেয়স্ (নিশ্চিতরূপে শ্রেয়) বা মোক্ষ—কর্ম্ম, জ্ঞান ও প্রেমের ত্রিবেণী সঙ্গমে। কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানে উপলব্ধি ও প্রেম-ভক্তিতে আনন্দে স্থিতি। মনে রাখিতে হইবে—

"প্রেমে বিশ্ব সমুদ্ভূত, জ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত, কর্ম্মে সঞ্জীবিত।
প্রেমময় জ্ঞানময় বিভু সদা কর্ম্মশীল।"

শ্রীগীতায় উক্ত ভাবগুলি রূপকথার আশ্রয়ে বুঝিবার চেষ্টা করিলে, ভগবানের তত্ত্ব নিরূপণ করা সুকঠিন হয়। কারণ রূপকথা রূপের কল্পনা করিয়া ভাবকে ব্যতিরেকমুখী বা বহির্মুখী করে। ভাব বা সৎ কে জ্ঞান বা চিৎ সংযোগে অন্বয়মুখী বা অন্তর্মুখী করিলে তবেই সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি হইবে। গীতার দশম অধ্যায়ে তাঁহার বিভূতি বর্ণনা কালীন ৩২ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন "বিদ্যানামহমধ্যাত্মং" (বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা)। সুতরাং তাঁহাকে অন্তরাত্মাতেই অধিষ্ঠিত বুঝিতে হইবে। তবেই ত' আমরা গীতার ৭।২৪ শ্লোকে

'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ" (মূঢ়জনে অব্যক্ত আমাকে ।্যক্তিভাব প্রাপ্ত মনে করে) কথার সার্থকতা বুঝিতে পারিব।

আর এক কথা। অর্জ্জুনের চিত্তের তরঙ্গ অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ।াইতেছেন। কিন্তু সেই তরঙ্গগুলি কি প্রকার অর্থাৎ অর্জ্জুনের ।ংশয় কি—তাহা অধিকাংশ স্থলে প্রকাশ না থাকায় গীতার ধারা-।াহিকতা উপলব্ধি হয় না, ফলে গীতা বুঝিবার অসুবিধা হয়। ।ংস্কৃতভাষায় সম্যক অধিকারের অভাবও গীতা বুঝিবার পক্ষে আর একটি প্রতিবন্ধক। এই সকল সমস্যা সমাধান কল্পে এই গীতা-কথা বঙ্গভাষায় গদ্যে সামান্য আকারে প্রকাশিত হইল। আশা ৮রি সুধীজন ইহাদ্বারা উপকৃত হইবেন। ইতি—১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭

প্রকাশক

"ন মৈয্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ কথিতা ধানা প্রয়োবীজায় নেশতে॥"

শ্রীভাঃ—১০।২২।২০

কর্ম্মেতে সাধন যোগ জ্ঞানেতে সন্ন্যাস।
ভক্তির সাধন প্রেম চৈতন্য বিলাস॥

"ন হি অসংন্যস্ত সংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন"

সূচীপত্র

গীতা কথা

—০॰*॰০—

প্রথম অধ্যায় (বিষাদ যোগ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতান্তর্গত ঔপনিষদীয় ব্রহ্মবিদ্যাতে যোগ যুক্তির বর্ণনা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে করা হইয়াছে। ইহাতে তিনটি ষটক (ছয় অধ্যায়) নিবদ্ধ আছে। স্থূল হইতে সদসৎ বিচার সুরু হইয়া প্রথম ষটকে সন্নিষ্ঠার সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। তম্মধ্যে এই প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমাংশে অর্জ্জুনের ধর্ম্মসঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের স্মরণাপন্ন হইয়া নিজেকে শিষ্যরূপে নিবেদন করা তথা উপদেশ প্রার্থনাদির বর্ণনা আছে।

শ্রীমান অর্জ্জুন শক্তি ও সামর্থ্যে অতুলনীয় ক্ষাত্রবীর। ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ থাকা হেতু এতকাল স্বীয় পৌরুষবলে রাজ্য লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। জ্যেষ্ঠতম ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের প্রতীকস্বরূপ। তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বীয় পৌরুষ প্রদর্শনে অপারগ অর্জ্জুন, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ছল চাতুরীর প্রতিকার করিতে পারেন নাই। পরে, ধর্ম্মপাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াও

কৌরবগণ হইতে নিজ রাজ্য, ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরিয়া পাইলেন না। এমন কি পাঁচখানি গ্রাম (জমিদারী ভূসম্পত্তি) পর্য্যন্তও পঞ্চপাণ্ডবকে দিতে দুর্য্যোধনের মতি হইল না। এমন অবস্থায় যুদ্ধ অনিবার্য্য। তাই দুই পক্ষ, কুরু ও পাণ্ডবগণ, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে একত্রিত হইয়াছেন। অর্জ্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের কপিধ্বজ রথের সারথী। অর্জ্জুনের গাণ্ডীব নামে প্রসিদ্ধ ধনু, অর্জ্জুনের হাতেই রহিয়াছে। যুদ্ধে জয়লাভ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জ্জুন এতকালের রোষানলে আজই শত্রু পক্ষকে দগ্ধ করতঃ ভস্মীভূত করিবেন। তাই উৎসাহের সহিতই সারথীসখা শ্রীকৃষ্ণকে রথ হাঁকাইতে বলিলেন। আরও বলিলেন যে, উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ দাঁড় করাও যেন আমি প্রতি যোদ্ধা বাছিয়া লইতে পারি। আদেশমত রথ যথাস্থানে রক্ষিত হইল কিন্তু, অর্জ্জুনের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। শত্রু-পক্ষীয়গণের মধ্যে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনগণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন যে তাঁহার মুখ শুষ্ক তথা গাত্র শিথিল হইতেছে, শরীর কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্তমুষ্টি শিথিল হওয়তঃ গাণ্ডীব ধারণে অক্ষম হইতেছে, চর্ম্মজ্বালা করিতেছে, মন বিঘুর্ণিত হইতেছে, অশুভ লক্ষ্মণ সকলও দৃষ্ট হইতেছে। এই স্বজনগণকে বধ করিয়া কুশল মোটেই দেখিতেছেন না। তিনি যুদ্ধজয়, রাজ্যলাভ, সুখভোগ কিছুই চাহেন না। কেন না, যাহাদের জন্য রাজা হওয়া বা সুখভোগ ইত্যাদির ইচ্ছা পোষণ করেন, তাঁহারা তো সকলেই এই প্রতিপক্ষীয়

দিগের মধ্যে, ধন প্রাণের মমতা ত্যাগ দিয়া, এই যে দাঁড়াইয়া আছেন। ইহাঁদিগকে মারিয়া ফেলিয়া রাজ্যসুখ তথা নিজের জীবনেরেই বা কি সার্থকতা থাকিবে? কৌরবগণ দ্বারা হত হইলেও তিনি তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে অক্ষম। এক পৃথিবীর রাজত্ব ত দূরে থাকুক ত্রিলোকের রাজত্ব পাইলেও তিনি ইহাদিকে বধ করিতে ইচ্ছুক নহেন। শাস্ত্রমতে যদিও আততায়ী অবশ্য বধ্য, তথাপি ইহাদের বধে পাপই হইবে। ইহারা লোভে হতজ্ঞান বলিয়া কি, তাঁহাদেরও অজ্ঞানী হইতে হইবে? কুলক্ষয় জনিত দোষ তথা মিত্রদ্রোহ জনিত পাতকের বোধ, এই কৌরবগণের না হইলেও কি তাঁহাদের (পাণ্ডব গণের) হইবে না বা হওয়া উচিত নয়? ইহা হইতে তাঁহারা (পাণ্ডবগণ) নিবৃত্ত কেন না হইবেন?

অতঃপর অর্জ্জুনের প্রজ্ঞাবাদ সুরু হইল যে, কুলক্ষয়ে চিরন্তনী কুলাচারধর্ম্ম নষ্ট হয়। কুলাচারধর্ম্ম নষ্ট হইলে সমগ্র কুলে অধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত হয়। অধর্ম্মাচ্ছন্ন হইয়া কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়। দুষ্টাস্ত্রীতে বর্ণশঙ্কর জন্মে। বর্ণশঙ্কর কুলের নরকের কারণস্বরূপ হয়। এইরূপে কুলঘাতকদের পিতৃগণ, পিণ্ডোদক ক্রিয়ার লোপে স্বর্গ হইতে পতিত হয়। কুলঘাতকদের এই বর্ণশঙ্কর কারক দোষ হইতে চিরন্তনী বর্ণ্যধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হয়। কুলধর্ম্মই যদি উচ্ছিন্ন হইল তবে তো চিরস্থায়ী নরকেরই জীব হইতে হইবে! এইটিই ত' বৈদিক মিমাংসার জ্ঞান। হায়! হায় কি পরিতাপের বিষয় যে, রাজ্যলাভ সুখের আশায়

স্বজনগণ বধে কৃতনিশ্চয় হওয়তঃ এত বড় পাপে ডুবিতেছিলেন! ইহার প্রতিকার ত' তবেই হইবে, যদি নিরস্ত্র অর্জ্জুনকে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ বধ করে, এবং তাহা হইলেই ত' খানিকটা পাপও কাটিয়া যাইতে পারে। এইরূপে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত অর্জ্জুন ধনুর্ব্বান ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে রথের উপর বসিয়া পড়িলেন।

[হিন্দু, বৌদ্ধ, মহম্মদীয়, খৃষ্ঠান্ ইত্যাদি সকল ধর্ম্মগ্রন্থেই, সৎ ধর্ম্মনিষ্ঠার উপদেশ আছে। সত্য ও অহিংসাকে ভিত্তি করিয়া সকল ধর্ম্মের ধর্ম্মগুরুগণই ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সাধনাদ্বারা অনুশীলিত হইলে অন্তরাত্মা উজ্জ্বল আলোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে ইহাতে আর সংশয় কি!]

এই কুরুক্ষেত্রে আমরা অর্জ্জুনের মধ্যে অহিংসার জাজ্বল্যমান প্রতীক দেখিতেছি। হিংসা বিরতি হইতে অর্জ্জুনের অন্তরাত্মা প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। তাই ভবিষ্যত দৃষ্টিতে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছেন। জ্ঞাতি আত্মীয়গণকে বধ করিলে কুলস্ত্রীগণ বিধবা হইবেন। বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ যাহারা অপূর্ণকাম থাকিয়া স্বর্গস্থ হইয়াছেন, তাহারা সকলে জন্মাইতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে, স্ত্রীগণও সকলেই পতি সহগামিনী হইবেন না। কালক্রমে দুর্জ্জয় কামের বশবর্ত্তিনী হইয়া অন্য পুরুষে রতা হইবেন। তাহার ফলে, একের ক্ষেত্রে অন্যের উদ্ভবরূপ বর্ণশঙ্কর অনিবার্য্য। পূণ্যক্ষীণ

হইলে স্বর্গস্থ পিতৃগণ পিণ্ডার্থে (অর্থাৎ স্থূল শরীর ধারণের জন্য) উদক্ ক্রিয়ার (রজঃ তথা বীর্য্যের মিলন সংঘটন) অভাব হেতু নীচুকুলে জন্ম লইতে বাধ্য হইবেন। তাহা হইলেই ত' অশুচি নরকে পতিত হইলেন। হয়ত, ক্ষত্রিয় আত্মার বৈশ্যকুলে পতন হইবে। তবে ত' বর্ণ্যধর্ম্মও গেল। এক কুলধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে সনাতন বর্ণ্যধর্ম্মেরও বিশৃঙ্খলতা সংঘটিত হইবে। তবে মানবীয়তার সনাতন জাতিধর্ম্মের সার্থকতা থাকিবে কোথায়! শুধু কিনা, রাজ্য সুখভোগ লোভই, এই মহা অনর্থের হেতু! অহো ধিক্! এমন জীবনেরই বা কাজ কি! এই সকলই, অর্জ্জুন তাহার প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া শোকাকুলিত চিত্তে, শর ও ধনু ত্যাগ করতঃ রথের উপর বসিয়া পড়িলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় (সাংখ্য যোগ)

উক্তরূপে অর্জ্জুনের অশ্রুপূর্ণাকুল নেত্রদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাঁহাকে ভৎর্সনা করতঃ কহিলেন যে—প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় তোমার এই মোহ, যাহা যশ ও স্বর্গের হানিকর, এই সঙ্কট কালে কোথা হইতে তোমাকে আশ্রয় করিল। ইহা তোমার হৃদয় দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক মাত্র। এই দৌর্ব্বল্য স্বাভাবিক ভাবে নর বা নারী কাহাকেও সাজে না। নপুংসকই ইহার আধার বা আশ্রয় স্থল। তুমি ইহা ত্যাগ কর, ইহা তোমাকে সাজে না, তুমি উঠিয়া দাঁড়াও।

[আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীভগবান অর্জ্জুনের সন্নিষ্ঠাকে আমল দিলেন না ; বরং এই সন্নিষ্ঠাকে হৃদয়দৌর্ব্বল্যের আখ্যা দিয়া নপুংসকের ভূষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। মোটামুটি শ্রীভগবান বুঝিলেন যে অর্জ্জুন তমোগুণে মোহাচ্ছন্ন হইয়া আছেন। পক্ষান্তরে ভৎর্সিত অর্জ্জুন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার সখা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরের প্রকৃত বেদনাকে মায়ার কান্না ভ্রমে এইরূপ কথা প্রয়োগ করিয়াছেন।]

তাই অর্জ্জুন স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে,—হে মধুসূদন, আমি যুদ্ধে কিরূপে পূজনীয় স্নেহময় বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, যিনি স্বীয় পক্ষপুটের আশ্রয়ে আমাদিগকে পালন করিয়াছেন, তথা পূজনীয় ধনুর্ব্বেদের গুরু দ্রোণাচার্য্য, যিনি আমাকেই সকল

শিষ্য অপেক্ষা অধিক প্রিয়তম মনে করেন—ইহাদের প্রতিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিব ? ইহাঁদিগকে বধ করিয়া যুদ্ধে বিজয়ী হওয়তঃ রাজ্যলাভান্তর, অন্নগ্রাস মুখে তুলিতেই ত' রুধিরলিপ্ত মনে হইবে ! ইহার চেয়ে কি ভিক্ষান্ন ভোজন শ্রেয় নহে ? একবার মনে হয়, যাহাদিগকে ছাড়িয়া আমরা নিজেদের জীবনকেও বিফল মনে করি—তাহারই বরং আমাদিগকে জয় করুক। জয় বা পরাজয়—ইহার মধ্যে কোনটি যে আমাদের বাঞ্ছনীয় তাহাই ত' বুঝিয়া উঠিতেছি না। এই জ্ঞাতি বান্ধবগণের প্রতি মমত্ব বোধে, নিজকুল তথা জাতির ধর্ম্মহানি সহ্য করিতে পারিতেছি না ; পক্ষান্তরে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ পরাঙ্মুখিনতার ফল স্বরূপ নরকের ভয়। এই উভয় ধর্ম্মসঙ্কটের মধ্যে পড়িয়াই আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি। তোমার শরনাপন্ন জিজ্ঞাসু আমি, আমায় শ্রেয় সাধন উপদেশ কর। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জনিও যে, পৃথিবী বা স্বর্গের কোন সম্পদের লোভ দেখাইয়া, আমার বর্ত্তমান শোকজ্বালা অপনোদন করিতে পারিবে না। অতএবই আমি যুদ্ধ করিব না।

এইরূপে উভয় সেনার মধ্যে তুষ্ণিম্ভূত অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতেই বলিলেন যে—"আত্মার পতন হয়," "আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন,"—ইত্যাদিরূপ তোমার বাক্য হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, তুমি আত্মার চিরস্থায়িত্বে নিঃসন্দিগ্ধ। বেশ, তবে তুমি কাহার জন্য কাঁদিতেছ ? নিত্য আত্মার জন্য তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের শোক করিবার কোন্ হেতু নাই। যে বস্তু

ছিল, আছে এবং চিরদিনেই থাকিবে—তাহার বিষয় শোক কি কি সম্ভবে? তবুও তুমি যে শোকান্বিত হইয়াছ, ইহা হইতে বুঝিতেছি যে—তুমি নাম ও রূপে মোহগ্রস্ত। তোমার ধর্ম্মভীরুতা অযৌক্তিক। কারণ, যাহার স্থিতিশীলতা নাই, সেই অসৎ, কি করিয়া প্রজাগণকে ধারণ করিয়া থাকিতে পারে? সৎ—এরই বিশ্ব ধারণে সক্ষমতা সম্ভব। অতএব সৎ এর নিরূপণ করতঃ সৎ এ লক্ষ্য রাখিয়াই ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়। নাম ও রূপ অসৎ। অতএব নাম ও রূপের সম্বন্ধে যে তোমার ধর্ম্মহানির ভয় উদিত হইয়াছে, উহা কশ্মল (মোহ) ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর যদি বল যে—ইহাঁরা এই নামে তথা এই রূপে ত' থাকিবে না, যাঁহাদের নামরূপের সম্পর্কে কতই না উপকৃত হইয়াছি তথা এই যে আমার বর্ত্তমান জ্ঞান, বুদ্ধি তথা কর্ম্মকুশলতা যে পরম বান্ধবরূপী ভীষ্ম পিতামহ তথা ধনুর্ব্বেদাচার্য্য দ্রোণ হইতে বিবৃদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের জন্য কেন না শোক করিব? ইহার সমাধান কল্লে এটিও স্মরণ কর যে, আমি, তুমি বা এই রাজন্যবৃন্দ পূর্ব্বেও ছিলাম, এখনও আছি, ভবিষ্যতেও সকলেই থাকিব। তবে শোকের ব্যপার কি থাকিতে পারে? মনুষ্যগণ কি গতকৌমার ও গতযৌবন হইয়া শোকান্বিত হয়—অথবা তৎ তৎ কালীয় জ্ঞান বা কর্ম্ম হইতে কি কি লাভ হইয়াছে তাহাই বিচার করে? আরও দেখ—এই যে নাম রূপের সম্পর্ক, ইহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় মাত্র। অস্থায়িত্ব হেতু আজ যাহা সুখকর কাল তাহাই অপ্রীতিকর।

শীতোষ্ণের তূল্য উৎপত্তি বিনাশশীল। ইহা সহ্য করিতেই হইবে। যদি না কর, কোনও কালেই সমচিত্ততারূপ শান্তাবস্থা লাভ করিতে পারিবে না। সুখে দুঃখে সমচিত্ত ব্যক্তিই এই দুটি দেব দানবের লড়াই হইতে মুক্তি পাইতে পারে। যদি বল যে, বর্ত্তমানকে অনাদর করতঃ আমি তোমাকে এক অজানা ও অনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে প্রলুব্ধ করিতেছি, তাহার সমাধান কল্পে এইমাত্র বলিতে পারি যে, অসতের অস্তিত্ব তথা সতের অবিদ্যমানতা, নিতান্তই অলীক। যাহারা এই দুয়ের সীমান্ত দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই শুনা গিয়াছে যে, সৎ ও অসৎ, এই দুয়ের পরেই আত্মা অবস্থিত। সেই আত্মা দ্বারাই চরাচর বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তিনি সৎ ও নহেন, অসৎ ও নহেন। তাঁহার নাশ কেহই করিতে সক্ষম নহে। এই যে দেহ সকল—তাহাও সেই চিরস্থায়ী অবিনাশী আত্মারই দেহ। অতএব, শঙ্কা ত্যাগ কবিয়া যুদ্ধ কর। যদি মনে কর যে, আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান শুধু তোমার একেলার থাকিলেই ত' চলিবে না—প্রতিপক্ষীয় আত্মীয় যাহারা হত হইবেন, তাঁহাদের সুখ দুঃখ উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন? তাঁহাদিগকে বধে কি নিমিত্ত পাপ হইবে না? তথা আত্মীয় স্বজনগণের সুখ দুঃখ কি নিতান্তই উপেক্ষার যোগ্য? তবে পাপ পূণ্যেরই বা মূল্য কি? তাহার উত্তরে শোন—যে ব্যক্তি এই আত্মাকে হন্তা বলিয়া জানে তথা যে হত বলিয়া মনে করে, তাহারা উভয়েই অজ্ঞানী। আত্মা কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করেন না

বা মরেনও না, অথবা জন্মিয়া বিদ্যমানতারূপে বিশিষ্টও হয়েন না। আত্মা জন্মরহিত, নিত্য অবিকারী তথা অতি পুরাতন। শরীর হত হইলেও ইনি হত হন না। উক্তরূপে যিনি আত্মাকে জানেন তিনি কিরূপে কাহাকে আঘাত বা হত করিতে পারেন? তুমি মনে করিতেছ যে—তবে জন্ম ও মৃত্যু, দুইটিই কি ভ্রান্তিমূলক? না, ভ্রান্তিমূলক কেন হইবে? জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নতূন বস্ত্র পরিধানের ন্যায় আত্মার দেহত্যাগ ও দেহধারণকে বুঝিবে। বস্ত্র মলিন বা জীর্ণ হইলে তাহা পরিত্যাগ করাইবার কালে অপোগণ্ড শিশুই রোদন করিয়া থাকে কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্কের হর্ষই হয়। জ্ঞানবান ব্যক্তি আত্মাকে অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশুষ্য, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য্য জানিয়া শোক প্রাপ্ত হয়েন না। আর যদি তুমি বেদমার্গ ছাড়িয়া ন্যায় যুক্তি অনুসারে পরমানুবাদ দ্বারা স্থূল হইতেই চৈতন্যের উদ্ভব মানিয়াও লও তবু, নিত্য জন্মশীল তথা মরণশীল আত্মার জন্য শোক করিতেই পার না। কেন না জাত ব্যক্তির মৃত্যু অতি নিশ্চিত তথা মৃতেরও দেহধারণ অবশ্যম্ভাবী। এই অপরিহার্য্য বিষয়েই বা শোক কি? যে জীবগণ জন্মের পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল, মৃত্যুর পরও অব্যক্তই হইবে সেই অব্যক্তের নিধনে পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে?

তুমি মনে করিতেছ যে আমি এমন এক আত্মার বিষয় বলিতেছি, যাহা দেখা শুনা বা বলার বাহিরে, অথচ তোমাকে

ঐ তত্ত্বের দোহাই অন্ধের মত মানিয়া লইতে হইবে। সে বিষয়ে এই বলিতেছি যে, ঋষিগণ ঐ আত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখেন, জ্ঞানীগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আত্মার বিষয় বলেন বা শোনেন। কিন্তু শুনিয়াও আত্মাকে বুদ্ধির দ্বারা অবধারণ করিতে সক্ষম হয়েন না। সেই একই আত্মা নিত্য স্বরূপে সকল দেহীর দেহেই আবদ্ধ। কোন জীবের জন্যই তুমি শোক করিতে পার না।

তোমার শঙ্কা হইতেছে যে, তবে ত' হিংসাদি কর্ম্মে কোনও পাপই হয় না, তথা সদাচার বলিয়াও কোন ধর্ম্মেরই মূল্য নাই! এতদ্বিষয়ে এই শোন যে, যাহার যাহা স্বধর্ম্ম তাহার পক্ষে তাহাই সদাচার। তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার পক্ষে যুদ্ধই সদাচার। ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে অন্য শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের জন্য নাই। স্বধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করিলেও ত' তুমি, আত্মীয় স্বজন বধে বিরত হইতে পার না। স্বধর্ম্ম সাধনই স্বর্গের কারণ স্বরূপ। এই যে অযাচিত মুক্তদ্বার স্বর্গস্বরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা তোমার পক্ষে পরম ভাগ্য মানিতে হইবে। যদি এই যুদ্ধ না কর তবে স্বধর্ম্ম উপেক্ষা করা হেতু পাপগ্রস্থ হইবে। অধিকন্তু, লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্ত্তি ঘোষিত করিবে। উহা মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক। তুমি ভয়বশতঃ যুদ্ধে বিরত হইয়াছ মনে করিয়া মহারথগণ—যাঁহারা তোমার বীরত্বের প্রশংসা সর্ব্বদাই করেন—তাঁহারাও তোমাকে তুচ্ছ মনে করিবেন। তোমার শত্রুগণ তোমাকে দুর্ব্বল ভাবিয়া নিন্দা

করতঃ কতই অবাচ্য বাক্য উচ্চারণ করিবে। বল, তাহা হইতে আর বেশী দুঃখের কি হইতে পারে? পক্ষান্তরে, স্বধর্ম্ম নিরত হইয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেও স্বর্গলাভ করিবে; আর যদি যুদ্ধে জয়ী হও তবে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএবই যুদ্ধে কৃত নিশ্চয় হইয়া উঠিয়া দাঁড়াও।

তোমার শঙ্কা হইতেছে যে, আমি তোমাকে যে আত্মার বর্ণনা করিয়াছি তিনি দেহাদির সম্বন্ধ হইতে স্বতন্ত্র। সুতরাং তিনি পাপ পূণ্যের অতীত হইলেও তুমি দেহাত্মবুদ্ধি লইয়া হিংসাত্মক কর্ম্মে পাপভাগী হইবে না, সে কেমন করিয়া হইতে পারে! ইহার যুক্তি তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি সুখ ও দুঃখ, লাভ তথা অলাভ, জয় এবং পরাজয় সম্বন্ধে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্মানুরোধেই যুদ্ধ কর। এইরূপে কোনও পাপই তোমার হইবে না।

যদি বল যে সুধু যুক্তিবাদ শুনিয়াই তুমি কিরূপে সমবুদ্ধি বিশিষ্ট হইবে। তাই আরও বলিতেছি যে—এই যে সমবুদ্ধির যুক্তি বলা হইল, ইহা আমারও কিছু মনগড়া নয়। ইহা সাংখ্য শাস্ত্রেরই নির্ণীত তত্ত্ব। এই বুদ্ধিতত্ত্বই গুণসাম্যরূপা প্রকৃতির প্রথম বিকশিত ক্ষেত্র। ইহারই নাম প্রজ্ঞাভূমি। ইনি বেদস্বরূপা, সদা চিৎসত্ত্বায় উদ্ভাসিতা। এই প্রজ্ঞালোকেই সমস্ত বিশ্ব রচিত হইয়াছে। এই স্থানে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট লোকেরাই অবস্থান করেন। এই প্রজ্ঞাভূমিতে যুক্ত হইয়া যাহাতে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারিবে সেই যুক্তি বলিতেছি,

শ্রবণ কর। তাহার দ্বারা কর্ম্মবন্ধন চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিতে সক্ষম হইবে। এই যুক্তির নাম যোগ। ইহাতে আরব্ধ কর্ম্মের নাশ নাই। আরম্ভ করিয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না করিতে পারিলেও প্রত্যবায় পাপের ভাগী হইতে হয় না। অতি অল্প মাত্র এই যোগ আচরিত হইয়াও, মহৎ ভয় অর্থাৎ অধোগতি হইতে রক্ষা করে।

এই যোগে বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা রূপে একেতেই স্থিতিলাভ করে; অর্থাৎ বুদ্ধি প্রজ্ঞার সঙ্গেই যুক্ত থাকিয়া নিশ্চয় করে, বিষয়ে যুক্ত হইয়া কামাত্মিকা হয় না। কিন্তু যাহারা এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ করেন নাই, কাম কামনার মধ্য দিয়া তাঁহাদের প্রজ্ঞারশ্মি মলিন হওয়তঃ কোনও বিষয়েই সম্যক অবধারণ করিতে পারে না। অতএব তুচ্ছ অংশ মাত্রেই আসক্ত হইয়া মনে করে যে সবটাই পাইয়া বসিলাম। দেখ না, সম্পূর্ণ বেদের মধ্যে কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড দুটীই আছে। অথচ, সেই অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কার্ম্মকাণ্ডীয় স্বর্গভোগাদির ফলশ্রুতিতে মুগ্ধ হইয়া ভোগ ঐশ্বর্য্য লাভের উপায় স্বরূপে বিবিধ যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের প্রশংসায় আত্ম-বিস্মৃত হওয়তঃ মনে করে, যাহা কিছু সার বস্তু, ইহাই। পক্ষান্তরে, জন্ম তথা মৃত্যুরূপ অতি দুঃখের বিষয়কেও বরণ করিয়াই লয়। ভোগ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়া তাহা হইতে মৃত্যুরূপী কালদ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়া যে কত দুঃখের; তথা পুনঃ গর্ভ যাতনাদি সুরু করিয়া জীবনব্যাপী আধি ব্যাধি দ্বারা

ক্লিষ্ট হওয়ার দুঃখ, অনুমান করিতেই পারিতেছ। ভোগ ঐশ্বর্য্যে মত্ত ব্যক্তিগণের বিক্ষিপ্ত চিত্তের সমাধান বিষয়ে নিশ্চয়াত্মিকা প্রজ্ঞার উদ্ভব কখনই হয় না।

"বেদ সকল কি তবে মান্য নহে", এ আশঙ্কা করিও না। অক্ষর ব্রহ্মই বেদরূপে পরিণত হইয়া ত্রিগুণান্তর্গত বিষয় সমূহের সদসৎ বিচার করিয়া ব্রহ্ম নিরূপন করিয়াছেন তথা ভূরাদি সপ্তস্বর্গের ছন্দঃ বিভাগ ক্রমে ভোগ সাধন, স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ মান্ত্রবর্ণিক ব্রাহ্মণ এবং ফলশ্রুতিপূর্ণ সংহিতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকলই ত' ত্রৈগুণ্য বিষয় মাত্র। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গুণসাম্যরূপী প্রকৃতির অধিষ্ঠান প্রজ্ঞাক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইতে হইবে। এই ক্ষেত্র হইতেই প্রবৃত্তিরূপিনী রজোগুণ রাগাত্মিকা (বাসনাত্মিকা) বুদ্ধি সৃষ্টি করিয়া পৃথক পৃথক বা মিলিত রূপে ত্রিগুণের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। তাই বলি, তুমি ত্রিগুণের উর্দ্ধে থাকিয়া সমত্ব বুদ্ধিযোগে গুণসম্পর্ক হীন হও। তবেই ত' সুখদুখাদি দ্বন্দের সম্বন্ধ ছাড়িতে পারিবে ও চিরকাল এক রসেই শান্ত থাকিবে। এবং অভাব পূরণ তথা লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করতঃ আত্মাতেই তৃপ্ত থাকিতে পারিবে।

যদি বল, যে ইহা হইতেই তোমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি লাভ হইবে কি না। এতদ্বিষয়ে ইহাই প্রকৃষ্ট বচন হইবে যে,—সকল দিকে জল প্লাবিত হইলে এক ক্ষুদ্র কূপের প্রয়োজনীয়তা যতটুকু থাকে, বুদ্ধিতত্ত্বে অধিষ্ঠিত জ্ঞানীর সমস্ত বেদেও

ততটুকু প্রয়োজন থাকে। কারণ প্রজ্ঞার বিকাশই বেদজ্ঞান। সেই প্রজ্ঞাতে স্থির বিজ্ঞানী সমস্ত বেদজ্ঞানেরই অধিকারী হয়েন। অথবা বেদজ্ঞান দ্বারা প্রজ্ঞালাভের নিমিত্তই বেদোক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়। সেই প্রজ্ঞাতে স্থিত বিজ্ঞানীর উহা সতঃই লভ্য হয়।

আর যদি তুমি বল যে—ত্রিগুণ সম্পর্ক ছাড়িয়া আত্মতৃপ্ত থাকিলে, ভাল মন্দ বিচার পূর্ব্বক কর্ম্ম করা যাইবে কি প্রকারে? সদসতে নিরপেক্ষ থাকিয়া কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা যাইতে পারে? উত্তমাধম কর্ম্মফল বিচার পূর্ব্বক কর্ম্ম না করিলে আনুকুল্য হইবে কেমন করিয়া? তদ্বিষয়ের সমাধান পূর্ব্বক বলিতেছি যে, কর্ম্মেই তোমার অধিকার কিন্তু কর্ম্মফলে ত' তোমার কর্ত্তৃত্ব নাই। অতএবই কর্ম্মফল হেতু কর্ম্মে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। যদি বল, তবে কেমন করিয়া কর্ম্ম করিবে, তাহার যুক্তি শুন। সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমভাব বিশিষ্ট হওয়ার নাম যোগ। তুমি সেই সমত্ববুদ্ধি স্বরূপ যোগে থাকিয়া ফলাসক্তি বর্জ্জন পূর্ব্বক কর্ম্ম কর। সমত্বকেই যোগ বলে। প্রজ্ঞাতে (বুদ্ধিতে) যুক্ত থাকিলেই উহা সম্ভব হইবে। কারণ, হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম্ম অনেক সিঁড়ি নীচে—যথা (১) বুদ্ধি-তত্ত্ব

(২) অহঙ্কার

(৩) মন

(৪) বৃত্তি

(৫) জ্ঞানেন্দ্রিয়

(৬) কর্ম্মেন্দ্রিয়

(৭) প্রাণ

(৮) তন্মাত্র

(৯) ভূত

(১০) স্থূলদেহ

(১১) স্থূল দেহের কর্ম্ম

তুমি বুদ্ধিতত্ত্বের আশ্রয় লইবার জন্য সঙ্কল্প কর। ফল-কামীগণ অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীর জীব মাত্র। বুদ্ধিতত্ত্বে যুক্ত ব্যক্তি এই সংসারে পাপপূণ্যের গণ্ডীকে অতিক্রম করেন। সুতরাং বুদ্ধিতত্ত্বে (প্রজ্ঞাতে) যুক্ত হইবার নিমিত্তই যোগানুষ্ঠান কর। কর্ম্ম সকল করিয়াও তাহার ফলভোগী না হওয়ার কৌশলই যোগ। প্রজ্ঞাতে যুক্ত হওয়া রূপী যোগই কর্ম্মসম্পাদনের কৌশল (চাতুর্য্য); কারণ স্থিতপ্রজ্ঞের ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি দ্বারা শুধু বিচার থাকে, পক্ষান্তরে বাসনাত্মিকা বুদ্ধি থাকে না।

বুদ্ধিতত্ত্বে যুক্ত জ্ঞানীগণ কর্ম্মজাত ফল ত্যাগ করিয়া জন্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়তঃ সর্ব্বোপদ্রব রহিত পরম শান্তির অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। তুমিও তোমার সংস্কার সমূহের জন্য ভাবনা করিও না যে এতশত বিরুদ্ধ চিত্ত-সংস্কার থাকিতে, তুমি কি ঐ অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে? হাঁ, তুমিও পারিবে—যখন তোমার বুদ্ধি অসংখ্য বাসনারূপ জঙ্গল হইতে নির্গত

হইয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ করতঃ আর জানিবার বা বুঝিবার জন্য কৌতুহলী হইবে না, তোমার স্থির-প্রজ্ঞাতে সবই পরিস্ফুট দেখিতে পাইবে। ঐ বুদ্ধি তত্ত্বে স্থিতিলাভ কিরূপে হইবে তাহা শুন। নানা ফলশ্রুতি হেতু তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি, সদসৎ বিবেক দ্বারা অসৎ ত্যাগ করিয়া, যখন সৎ ধারণাতে নিশ্চল হওয়তঃ একাগ্রতা হেতু সমাধিতে অচলভাবে নিরুদ্ধ হইবে, তখনই তুমি প্রজ্ঞাতে স্থিতিলাভরূপী যোগপ্রাপ্ত হইবে।

এইবার অর্জ্জুনের স্থিতপ্রজ্ঞ হইবার ঐকান্তিক ইচ্ছা হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন যে—হে কেশব, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি এবং বুত্থিত অবস্থায়ই বা তিনি কিরূপে চলাফেরা করেন? শ্রীকৃষ্ণ তখন, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা করিতেছেন ঃ— হে পার্থ, যখন কেহ সমস্ত মনোগত কামনা পরিত্যাগ করিয়া আপনিই আপনাতে তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। যিনি দুঃখে উদ্বেগশূন্য, সুখে স্পৃহা শূন্য, যাঁহার অনুরাগ, ভয় এবং ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহাকে স্থিতধী মুনি বলা যায়। যিনি দেহ জীবনাদি সকল বিষয়েই মমতা-শূন্য, তৎ তৎ বিষয়ে শুভ প্রাপ্তিতে সন্তোষ বা অশুভ প্রাপ্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। কচ্ছপ যেমন কর চরণাদি অঙ্গ সকল সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, তেমনিই যিনি রূপরসাদি ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকল সংহরণ করিয়া লন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। কিন্তু, ইহা মনে রাখিও যে

নিরাহারী (বিষয় ভোগে নিবৃত্ত) ব্যক্তির ইন্দ্রিয় বর্গের তৎকালীন বিষয় উপভোগ নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু বিষয় তৃষ্ণা ত' থাকিয়াই যায়। তবে বুদ্ধির পরে স্থিত পরমাত্মাকে দেখিয়া বিষয় বাসনাও নিবৃত্ত হয়। হে কৌন্তেয়, চিত্তবিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়বর্গ যত্নশীল বিবেকী পুরুষের মনকেও বলপূর্ব্বক হরণ করে। তবেই দেখ যে, শুধু দৈহিক সংযম দ্বারাই প্রজ্ঞাতে স্থিতি লভ্য হইবার নহে। বরং সেই সকল ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আমি যে সকলেরই চিদাত্মাতে আনন্দবিগ্রহ রূপে অবস্থান করিতেছি, সেই আমাতে যুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে; কারণ আত্মানন্দে মগ্ন থাকিয়া চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইবে না এইরূপে যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশে আসিয়াছে তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত জানিও। আমাতে যুক্ত হইতে বলিয়াছি বলিয়া শঙ্কা করিও না। আমাতে (পরমাত্মস্বরূপ) যুক্ত না হইলে জীবপুরুষের পতন এবং নাশ অবশ্যম্ভাবী। তাহার কারণ, •বিষয় চিন্তাকারী পুরুষের বিষয়েই আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা, কামনা ব্যর্থ হইলে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিনাশ এবং তৎপরে বুদ্ধিনাশ হয়। বুদ্ধিনাশে ত' প্রজ্ঞাশ্রিত জীবেরই নাশ হইল। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যেন ভাবিও না যে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার অর্থ বিষয় সংশ্রব ত্যাগ করিয়া দেওয়া।

প্রজ্ঞা বিধি বিধান করেন হেতু, প্রজ্ঞা-স্থিত আত্মাই বিধেয়াত্মা। বিধেয়াত্মা রাগদ্বেষমুক্ত

আত্মবশীকৃত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় সমূহ ভোগ করিয়াও আত্মতৃপ্তই থাকেন। আত্মতৃপ্তিতে জীবের সমস্ত দুঃখেরই নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই স্থিতি লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাতে স্থিতি লাভ না করিয়াছে, সে কাম কামনা হেতু বুদ্ধিতত্ত্বের অতি নিম্নস্তরের বিষয়ে থাকিয়া বুদ্ধির অধিকারী হইতে পারে না। বুদ্ধিজাত যে ভাব, সেই ভাবও তাহার আয়ত্তীভূত নহে। অতএবই বিপর্য্যস্ত ভাব লইয়া শান্তির অধিকারীও হইতে পারে না। অশান্ত ব্যক্তির আবার সুখ কোথায়! ভবেই দেখ, প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরই সুখ হইতে পারে। অন্যথা, ইন্দ্রিয় বিষয়ে যে সুখ তাহা ভোগ করিবার মত বুদ্ধির স্থিরতাই যে হইতে পারে না। চিত্ত স্থির না রাখিয়া সুখ ভোগও ত' সম্ভব নহে। যেহেতু সুখভোগ কালীন চিত্তে ভাবী বিচ্ছেদ ভয় বা সন্দেহ উদ্রিক্ত হইয়া ব্যাঘাত জন্মায়। বুদ্ধিযোগ দ্বারা সৎ লক্ষিত চিৎ রূপে পরিণত হইয়া, কর্ম্ম ও জ্ঞানের পূর্ণতা দ্বারা পূর্ণ মনোরথ হইয়া জীব যখন স্বীয় আনন্দস্বরূপ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন তখন স্থূল বিষয় ভোগে নিরপেক্ষ হইয়া যোগে বা ভোগে সমানরূপে প্রসন্ন থাকেন। অযুক্ত আত্মার মন চলমান ইন্দ্রিয়গণের যেটিকে অনুসরণ করে, সেই ইন্দ্রিয়টী জলস্থিত নৌকাকে বায়ু যেমন চালিত করে তদ্রূপই প্রজ্ঞাকে হরণ করিয়া থাকে। সেই হেতুই হে মহাবাহো, যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহ হইতে বিমুখীকৃত

হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত জানিও। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির এবং বিষয়ীর মধ্যে কত অন্তর তাহা শুন। যে প্রজ্ঞালোকতত্ত্ব সর্ব্বসাধারণ ভূতগণের পক্ষে রাত্রি স্বরূপ অর্থাৎ বিষয় তমসাচ্ছন্ন, তাহাতে সংযমী পুরুষ দিবালোকের ন্যায় বিচরণ করেন এবং যাহাতে বিষয়াসক্ত ভূতগণ জাগিয়া থাকিয়া বিচরণ করে, সেই কাম কামনা রূপ অজ্ঞান তমকে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি রাত্রি তুল্যই জানেন (অর্থাৎ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকেন)। আশঙ্কা করিও না যে, তবে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি বিষয় ভোগ কিরূপে করিবেন? শুন, যেমন সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ, স্থির, একরূপ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত সমুদ্রে কতশত সহস্র সহস্র নদ নদী প্রবেশ করিয়া বারি রাশিকে ঢালিয়া দিতেছে, অথচ ঐ জলরাশির দ্বারা সমুদ্রের কিঞ্চিৎ মাত্রও বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচরে হয় না, তদ্রূপই সকল বিষয় প্রপঞ্চরাশি যে পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া বিলীন হয়, সেই শান্তি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিষয়ের পশ্চাতে ধাবমান ব্যক্তি উক্ত নিরবচ্ছিন্ন শান্তি পাইতে পারে না। যে পুরুষ সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার, নির্ম্মম হইয়া বিচরণ করেন, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন। হে পার্থ, এই ভূমিতে (অর্থাৎ প্রজ্ঞাতে) স্থিত ব্যক্তি কখনও মোহ গ্রস্ত হন না। এখানে স্থিতি লাভ করিয়া শরীর ত্যাগ করতঃ অন্তকালে ব্রহ্মনির্ব্বান প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

[এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যষ্টিতে সদসৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ম্মাকর্ম্মের অবতারণা পূর্ব্বক সংক্ষিপ্ত মীমাংসা হইল। সৎব্রহ্মনামক প্রজ্ঞাতে স্থিতি লাভ করাই ব্যষ্টিতে ধর্ম্ম তথা

কর্ম্ম। স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া কর্ম্মকরতঃ সমত্ববুদ্ধি ফলে পাপ পুণ্যের (ত্রিগুণের) অতীত হলেই শান্তিলাভ করা যায় এবং ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি]

তৃতীয় অধ্যায়—(কর্ম্ম যোগ)

অর্জ্জুন বলিলেন—হে জনার্দ্দন, উপরোক্ত তোমার যুক্তি তথা উপদেশাবলী শুনিয়া আমি সংশয়ে পড়িয়াছি। যদি তোমার মতে বুদ্ধিতত্ত্বে অবস্থান করাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবধারিত হইল, তথা বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম্ম অনেক নিম্নস্তরের ইহাও বর্ণিত হইল, তবে কি নিমিত্ত আমাকে হিংসাত্মক যুদ্ধকর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ? আমার মনে হইতেছে যে পরস্পর বিরোধী বাক্য দ্বারা আমাকে মোহিত করিতেছ। যদ্দ্বারা আমি শ্রেয় লাভ করিতে পারিব তাহাই সুনিশ্চিতরূপে একটি বল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অনঘ, আমিত' পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, এই জগতের স্থিতিস্থাপকতার মূল উৎস দুই প্রকারের যাহা হইতে বিশ্বকর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহলোকে জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যতত্ত্ব পর্য্যালোচকদের, তথা কর্ম্মযোগ দ্বারা ঐ তত্ত্বে স্থিতিলাভের প্রযত্নকারীদের স্থিতিস্থাপকতা লাভ হয়। এই দুই প্রকারেরই নিষ্ঠা আছে। পূর্ব্বে তোমাকে কর্ম্ম করিয়াও

তাহার ফলে বদ্ধ না হওয়ার যে কৌশল উপদেশ দিয়াছি—সেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি কর্ম্ম না করিয়া কেহই লাভ করিতে পারে না। তথা কর্ম্মফলসঙ্গ না ত্যাগ দিয়াও কেহই উপরোক্ত লক্ষ্য, নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি নামক প্রজ্ঞাতে স্থিতি লাভ করিতেও পারে না। কেন না কেহই ক্ষণকাল মাত্র কর্ম্মত্যাগে অকর্ম্মা হইয়া কখনও থাকিতে পারে না। প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা অবশ হইয়া সকলেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। যে মূঢ় কর্ম্মেন্দ্রিয়বর্গকে সংযত করিয়া মনে মনে বিষয় চিন্তা করে সে ত' কপটাচারী। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সকলকে মন দ্বারা সংযত করতঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা ফলাসক্তি বর্জ্জন পূর্ব্বক যোগাচরণ করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। কর্ম্ম অকর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। অধিকন্তু অকর্ম্মা থাকিলে তোমার দেহযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

যদি বল যে, ইহার দ্বারা ত' নির্ণীত হইল না যে কোন্ কোন্ কর্ম্ম আচরণীয়। তদুত্তরে শুন। যজ্ঞার্থে কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্মে লোক সকল বন্ধন প্রাপ্ত হয়। তুমিও যজ্ঞার্থেই ফলাশক্তি ত্যাগ দিয়া কর্ম্ম কর। যজ্ঞার্থে কর্ম্ম কিরূপ তাহা বলিতেছি। পূর্ব্বকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞসমেত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া এই বাক্য বলিলেন যে এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। এই যজ্ঞ তোমাদিগের অভিষ্ট-ভোগপ্রদ হউক। এই যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধিত কর এবং সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুণ। এই প্রকারে

একে অন্যের দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া পরম শ্রেয় লাভ করিবে। যজ্ঞদ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া দেবগণ তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ্যসমূহ দিবেন। তাহাদিগের প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু সকল তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া যে ভোগ করে, সে নিশ্চই চোর। যজ্ঞাবশেষভোজী সজ্জনগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। কিন্তু যাহারা কেবল নিজের জন্য পাক করে সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে। এখন বেশই বুঝিতে পারিলে যে বিশ্বকর্ম্ম পরিচালক দেবগণ হইতে আমরা নিজ নিজ প্রয়োজনে যাহা কিছু উৎপাদন বা ব্যবহার নিমিত্ত পাইয়া থাকি তাহার অগ্রভাগই সেই দেবগণের উদ্দেশ্যে ত্যাগ করার নামই যজ্ঞ। [যথা, শস্য কাটিয়া ঘরে তুলিয়া বীজ রক্ষা করিতে হয় এবং পক্কান্নের অগ্রভাগ অগ্নিতে আহুতি দিয়া নিজের জঠরাগ্নী বৃদ্ধি করিতে হয়।] অন্ন হইতে প্রাণীগণ, মেঘ হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে মেঘ, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, বেদ হইতে কর্ম্ম, অক্ষর হইতে বেদ উৎপন্ন হইয়াছে। সেই হেতু অক্ষর ব্রহ্ম, সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাহা হইলেই জানিতে পারা গেল যে—যে কোন যজ্ঞেই ভোক্তারূপে অক্ষররূপী বিষ্ণু বর্ত্তমান আছেন। এইরূপে যে বিশ্বচক্র প্রবর্ত্তিত আছে, যে ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপী ইহার অনুবর্ত্তন (অর্থাৎ বিশ্ব কর্ম্মচক্র পরিচালন সহায়তাকল্পে অংশ গ্রহণ) না করে, তাহার জীবন বৃথা।

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ সকল বিবেচনা করিয়া, তুমি সন্দেহ করিও না যে এই জগচ্চক্রের ব্যাপারে যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা অংশীদার

না হওয়ার ফলে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও পাপী হইবে। তাহা নহে, কারণ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ত' গুণসমূহের সাম্যাবস্থার ফলে জগচ্চক্রের বাহিরেই আছেন। ইহাই ত' ব্রাহ্মীস্থিতি। দেবগণ তথা ভূতগণেরই এই জগচ্চক্র চালনার দায়িত্ব। ইহারা ব্রহ্মার প্রীতির নিমিত্ত তথা আত্মার পূর্ণতা লাভের নিমিত্ত ইহা করিবেই। জীবগণ আত্মার পূর্ণতা সাধন করিলেই ব্রহ্মার প্রীতি জন্মে। কিন্তু, যিনি আত্মাতেই প্রীত আত্মাতেই পরিতৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন তাঁহার আবার কর্ত্তব্য কি? এই জগতে সেই স্থিতধী মুনি ব্যক্তির কর্ম্মদ্বারা কোনও অর্থ-সিদ্ধি তথা কর্ম্মের অকরণেও অনর্থের সম্ভাবনা মোটেই নেই। না ত' সর্ব্বভূত মধ্যে তাঁর নিজ প্রয়োজনে কিছু আশ্রয় করিবারও থাকে। অতএব তুমি সতত অসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। যেহেতু অসক্ত হইয়াই কর্ম্ম আচারণ করতঃ লোকে পরমপদ প্রাপ্তি করিয়া থাকে। জনকাদি রাজর্ষিগণও কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। আত্মস্থ হইয়াও লোক রক্ষা অর্থাৎ জগতে দৃষ্টান্ত স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্যেও তোমার কর্ম্ম করা উচিত। কেন না শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরিত পথেই জনসাধারণ চলিয়া থাকে। আমার ত' ত্রিলোক মধ্যে কিছুই অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য নাই, তবুও কর্ম্মে বর্ত্তমান আছি। যদি আমি অনলস ভাবে কর্ম্ম না করি, তবে মানুষেরাও আমারি পথে চলিবে। ফলে, আমার কর্ম্ম না করায় এই সকল লোক উচ্ছন্ন যাইবে এবং বিশৃঙ্খলতার মহাদায়িত্বও আমাকেই লইতে

হইবে। প্রজাগণের বিনাশ সাধন আমার দ্বারাই হইবে, কারণ আমিই যে কেন্দ্রিয়শক্তির আধারিভূত পরমাত্মা।

আত্মস্থ হইয়াও কেন কর্ম্ম করিতে হইবে তাহার উত্তর শুন। হে ভারত, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ আসক্ত হইয়া যেমন কর্ম্ম করে, জ্ঞানীগণ অনাসক্ত হইয়া তেমনই কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। জ্ঞানীগণ কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানীদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না অর্থাৎ নিজে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়তঃ অকর্ম্ম অবস্থালাভ করিয়া কর্ম্ম ত্যাগের প্রশংসা করিবেন না। বরং কর্ম্মসকল আচরণ করতঃ জনসাধারণকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিবেন। কারণ—নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া স্বভাবজ কর্ম্ম আচরণ ফলেই চিদাত্মার আবরণ ক্ষয় হয় এবং সম্যক জ্ঞানের উদয় হয়। তৎপূর্ব্বেই ব্রহ্মাজ্ঞানের মহিমা কর্ম্মাসক্ত জনসাধারণকে শুনাইলে কীটদষ্ট ফলের ন্যায় জীবের অপরিণত অবস্থায় নষ্ট ভ্রষ্ট হইবারই সম্ভবনা। প্রকৃতির গুণ দ্বারাই জীবগণের ক্রমোন্নতি, যথা অসৎ হইতে সৎ সৎ হইতে চিৎ এবং চিৎ হইতে আনন্দ—এই পর্য্যায়ক্রমে পদলাভ হইয়া থাকে। অহঙ্কারমুগ্ধ জীব মনে করে আমিই কর্ত্তা। কিন্তু হে মহাবাহো, গুণ ও কর্ম্ম সমূহের বিভাগ যাঁহারা তত্ত্বতঃ জানেন গুণ পরিণাম স্থূলভূত তথা রূপরসাদি বিষয়সমুহ সত্ত্ব রজঃ, তম গুণত্রয়েরই সম্পূর্ণ আশ্রিত জানিয়া তাঁহারা কর্ত্তৃত্ব অভিমান ত্যাগ দেন। প্রকৃতির গুণে বিমোহিত ব্যক্তিগণ গুণজাত দেহেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে প্রসূত কর্ম্মে আসক্ত হয়। প্রাজ্ঞ পুরুষ সেই সব অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে গুণতত্ত্ব ব্যাখ্যা

করতঃ নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধির উপদেশ দিবেন না। কারণ জ্ঞানদ্বারা সদসৎ বিচার করিয়া যোগ সাধন দ্বারা যে সন্নিষ্ঠাকে লাভ করিতে হয়, সন্নিষ্ঠানামক প্রজ্ঞাভূমিতে স্থিতিলাভ না করিয়াই অজ্ঞানীরা নৈষ্কর্ম্ম্যের কপটভাব প্রদর্শনে চেষ্টান্বিত হইয়া তথাকথিত সন্ন্যাসী, গোঁসাই, বাবাজী সাজিয়া স্বীয় আত্মার তথা জনসাধারণের সমূহ ক্ষতি সাধন করিবে।

অর্জ্জুন মনে মনে চিন্তা করিতেছেন যে—কর্ম্মফলে নিরপেক্ষতা অর্থাৎ আত্মার উদাসীনতা রক্ষা করতঃ প্রকৃতির গুণে কর্ম্ম এই দেহাস্ত্রিয়াদি দ্বারা হইতেছে ইহা লক্ষ্য মাত্র রাখিয়া, কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে কিরূপে? উহাত বালকক্রীড়ার মতই ফলীভূত হইবে। উদ্দেশ্যবিহীন তথা সঙ্কল্পবিহীন হইয়া শিথিল মন তথা শিথিল অঙ্গ দ্বারা আবার যুদ্ধ করা চলে না কি? তদুপরি আবার সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য ব্যাপার এই যে প্রকৃতির গুণে মুগ্ধ না হইলেই ত' অহঙ্কার দমিত থাকিবে। কিন্তু ইহা কি আমার সাধ্যায়ত্ত হইবে? শ্রীভগবান অর্জ্জুনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন যে—তুমি আত্মাধিগত চিত্তদ্বারা আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মের বলাবল ফলফলাদি গচ্ছিত রাখিয়া কামনা ও মমতাহীন হওয়তঃ শোক পরিহার পূর্ব্বক যুদ্ধ কর। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে প্রজ্ঞাতে স্থিতিলাভ শুধু সাময়িক ভাবে হইলেই যে তোমার অধঃপতন হইবে না তাহা নহে। সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বুত্থানে বিষয় সংস্পর্শজনিত অধোগতির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেই

প্রজ্ঞাভূমিতে যদি আমাপরায়ণ হয়, তবেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তদ্রূপে তুমি যদি আমাপরায়ণ হইয়া যুদ্ধ কর্ম্মে রত হও, তবেই প্রকৃতির গুণ দ্বারা মোহরূপ অহং ফুটিয়া উঠিবে না। ইহা ব্যতীত যাঁহারা আমার এই 'আত্মসমর্পণ' রূপ মহাবাক্যকে অনাদর করতঃ শুধু যাগযজ্ঞাদির অঙ্গসমূহ সাধন দ্বারা কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা বিফল মনোরথ হইবেন। যাঁহারা শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূণ্য হইয়া প্রতিনিয়ত আমার এই মতকে অনুসরণ করেন, তাঁহারাই কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন। পক্ষান্তরে, অসূয়াপরবশ অবিবেকী যাঁহারা আমার এই মতের অনুষ্ঠান না করেন তাঁহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞান বিমূঢ় বলিয়া জানিত। কেন না জ্ঞানীগণও নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারেই কর্ম্ম করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ প্রকৃতিরই পদানুসরণ করে। শুধু ইন্দ্রিয় বা প্রাণ তথা মন-সংযমে কি ফল হইবে? সকল ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে আসক্তি বা ঘৃণার উদ্রেক হইবেই। এই দুইটীর (রাগ ও দ্বেষের) বশে যেন পড়িও না। উহারাই ত' জীবের শ্রেয় সাধন পথে বিঘ্নকারক।

অর্জ্জুন মনে ভাবিতেছেন যে—উপরোক্ত যুক্তিপথে চালিয়া শুধু অভ্যস্থ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে, নূতন কোনও কিছু উদ্ভাবন করা বা শ্রেষ্ঠতর নূতন কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা মোটেই সম্ভবপর হইবে না। প্রজ্ঞাতে থাকিয়া চিৎসত্ত্বাতে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিতে হইলে, প্রজ্ঞার নিম্নভূমির সঙ্গে সাক্ষ্যাৎ

সম্বন্ধ শিথিল হওয়তঃ অহঙ্কার ফুটিয়া উঠিবে না সত্য। কিন্তু এ অবস্থায়, ইন্দ্রিয়নিচয়ের রাগ দ্বেষাদির সহিত জীবের সম্পর্ক-হীন হওয়ার ফলে নূতন নূতন সংস্কারও জন্মিতে পারিবে না! তবে নূতন নূতন কর্ম্ম বা কিরূপে সম্ভব হইবে? ভাব বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে—দেখ, নিজের ধর্ম্ম যদি গুণহীন হয়, তবু উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য। স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়; কিন্তু পরধর্ম্ম ভীতিপ্রদ। তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার যুদ্ধ সংস্কার সহজাত। যদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্মসংস্কারের জন্য লুব্ধ হও, তবে এতদিনের সাধনা ত' গেলই, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণের সংস্কার পূর্ণরূপে না পাইয়া প্রজ্ঞাচ্যুত হওয়তঃ আত্মনাশ করিবে মাত্র।

অর্জ্জুন বলিলেন—আচ্ছা, কর্ম্মতত্ত্বের মীমাংসা ত' অমৃতোপম শ্রবণ করিলাম। কিন্তু আমার এক প্রশ্ন এই যে, কাহার প্রেরণায় এই জীবগণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপাচরণ করে? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—এইটী হইতেছে রজোজাত কাম ও ক্রোধ। এই কামের পূর্ত্তি কখনও হয় না তথা এই ক্রোধের সমান অনর্থকারীও আর কিছুই সম্ভাব্য নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমরা প্রজাপতি ব্রহ্মার নিয়োগে দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে সংসারে আসিয়াছি। দেবগণও আমাদের প্রীতির নিমিত্ত অভীষ্ট দান করিতেছেন। উভয়ে উভয়ের দ্বারা পুষ্ট তথা তৃপ্ত হইয়া মূল প্রকৃতি ও পুরুষের অনাদি লীলার সহচর হয়। ইহাই বিশ্বসৃষ্টির

উদ্দেশ্য। কিন্তু জীবগণ অজ্ঞানতার ফলে মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হওয়তঃ রজোগুণে রঞ্জিত হইয়া অহঙ্কার বশে কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া ঈশ্বরীয় কর্ম্মে নিজেরাই কর্ত্তা সাজে। কিন্তু ফল নিজের মনোমত না হইলেই সেই রাগাত্মক কাম হইতে ক্রোধ জন্মে। এই ক্রোধ হইতেই যত পাপের উৎপত্তি। অংশরূপী জীব, পূর্ণ পুরুষের লীলাকে স্বীয় ভোগার্থে জানিয়া লইয়া জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করতঃ সহস্র কোটী জনমেও মনোরথ পূর্ণ করিতে পারে না; তাই কাম দুষ্পূরণীয়। এই কাম বা রাগের এবং তৎফল স্বরূপ ক্রোধের মূল উৎস অজ্ঞানতা। ইহা কিরূপে জন্মে তাহা শ্রবণ কর। জীবগণ চৈত্যনাংশরূপী। পূর্ণ চৈত্যন্যের অবধারণ করিতে সক্ষম হয় না। এই অবস্থায় যখন সত্ত্বগুণে অবস্থান করে তখন ধূমাবৃত বহ্নির ন্যায় পূর্ণ চৈতন্যের বোধ হয় কিন্তু রজোগুণে জীবাত্মা কামপরবশ হওয়তঃ মলিন দর্পণে প্রতিফলিতের ন্যায় আবৃত হয়েন। আর যখন ঈপ্সিতলাভের বিঘ্ন দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া তমোগুণে আচ্ছন্ন হওয়তঃ জরায়ুদ্বারা আবৃত গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় জীবাত্মা অন্ধতমসাচ্ছন্ন হয়েন তখন তাঁহার আত্মপর কাহাকেও লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা মাত্রও থাকে না। কামকে এইরূপ মহাশত্রু বলিয়া জানিও। জীবগণ স্বভাবতঃ চৈতন্য সত্ত্বা হইতে উদ্ভুত; জ্ঞানী হইয়াও দুষ্পূরণীয় অনল সদৃশ কামরূপী নিত্য শত্রুদ্বারা বেষ্টিত তথা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অনল সদৃশ বলার তাৎপর্য্য এই যে উহা হইতে সর্ব্বনাশকারী

ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয় সকল মন, ও বুদ্ধি এই কামের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। এই কাম ঐ সকল ক্ষেত্র সাহায্যে জ্ঞান আবৃত করিয়া জীবকে বিমোহিত করে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ, এইজন্যই তুমি প্রথমেই ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত করতঃ পাপরূপ জ্ঞানবিজ্ঞাননাশক এই কামকে জয় কর। শরীরে সংযম করিবার ক্ষেত্র মধ্যে ইন্দ্রিয়গণই শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠতর আবার ইন্দ্রিয় ও মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠতম। বুদ্ধি হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা। এইরূপে বুদ্ধির পরে স্থিত আত্মাকে জানিয়া সদাত্মা দ্বারা কামাত্মকে নিরোধ করতঃ কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে নাশ কর। [তুমি ইন্দ্রিয়াধীন থাকিয়া মনও বুদ্ধির দ্বারা কোনই সাহায্যই পাইতে পার না, অথবা মনের অধীন তথা বুদ্ধির অধীন থাকিয়াও কাম জয়ী হইতে পারিবে না। কেন না উহারা সকলেই কামের ক্ষেত্র। অতএবই তোমাকে কামের গণ্ডী ছাড়াইয়া আত্মজ্ঞানী হওয়তঃ এই দুর্জ্জয় শত্রুকে বশে আনিতে হইবে। তোমার নিজ সিংহাসনরূপী প্রজ্ঞাভূমিতে সদজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলেই বুদ্ধি, মন তথা ইন্দ্রিয়াদি সকলেই বশ্যতা স্বীকার করিবে।]

——

চতুর্থ অধ্যায় (জ্ঞান যোগ)

শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন—এই যোগযুক্তি যাহা আমি তোমার কাছে ব্যক্ত করিলাম ইহা কিছু নূতন আবিষ্কৃত নহে। ইহা আমি প্রথমে সূর্য্যদেবকে বলি, সূর্য্যদেব মনুকে বলেন, এবং মনু ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন। এইরূপে পরম্পরা-প্রাপ্ত এই যোগকে রাজর্ষিগণ জানিতেন। কিন্তু সুদীর্ঘ কাল-বশে নষ্টপ্রায় হইয়াছে। সেই পুরাতন যোগই আবার আজ আমি তোমাকে বলিলাম। তাহার কারণ এই যে, তুমি আমার একান্ত অনুরক্ত সখা এবং ইহাও অতি উত্তম রহস্য (যুক্তিবিদ্যা)—অর্থাৎ দুজ্ঞেয় তথা বুদ্ধি দ্বারা দুর্ভেদ্য।

অর্জ্জুনের শঙ্কা হইল তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে—সূর্য্যদেবের জন্ম তোমার কত পূর্ব্বে হইয়াছে, আর তোমার জন্ম কত পরে! কি করিয়া জানিব যে তুমি সূর্য্যদেবকে প্রথমে যোগ উপদেশ করিয়াছিলে? শ্রীভগবান বলিলেন যে—হে অর্জ্জুন, তোমার এবং আমার কত জন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সেই সকলই অবগত আছি, কিন্তু তুমি তাহার কিছুই জান না। • জন্মরহিত অব্যয় সদাত্মা তথা প্রাণীসকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মাধীন সদসৎনামা মায়ার সাহায্যে জগতে আবির্ভূত হই। [সৎরূপী ব্যক্তি তথা অসৎরূপী বিকৃতি, এই দুই পরস্পর বিরোধী ভাবের

বিকাশ শক্তিকেই 'মায়া' বলা হয়। 'মা' নিষেধে, তথা "যা" প্রকাশে বা গমনে।] কালক্রমে অসৎশক্তি নিয়োজিনী অবিদ্যামায়া দ্বারা সৎশক্তি বিদ্যামায়া অভিভূতা হইয়া সৎধর্ম্মী সাধুগণের ক্লেশের কারণীভূতা হয়। এতদ্রূপে ধর্মের গ্লানি হওয়তঃ যখনই অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আমার আত্মাকে শরীর রূপে সৃজন করি। সাধুজনগণ ক্লিষ্ট হইলে, জগদাত্মা আমি ক্লিষ্ট হই। কারণ সাধুগণের চিত্তেই আমি প্রকৃষ্টরূপে পরিস্ফুট হই সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন (সৎধর্মশিক্ষা) জন্য আমি যুগে যুগে শরীর ধারণ করি। আমি জন্ম কর্ম্ম রহিত হইয়াও, জন্মগ্রহণ করি। এই যে অপ্রাকৃত ঈশ্বরীয় ব্যাপার, ইহা যে ব্যক্তি যথার্থতঃ জানিতে পারেন, তিনিও শরীর ত্যাগ করিয়া পুণর্জন্মভাগী হয়েন না, বরঞ্চ আমাকেই লাভ করেন। অর্থাৎ যোগযুক্ত না হইয়া কেহই আমার দিব্য জন্ম কর্ম্ম জানিতে পারেন না। আমার অপ্রাকৃত জন্ম তথা কর্ম্ম কিরূপে জানিতে সক্ষম হইতে পারা যায় তাহা বলিতেছি। রাগ, দ্বেষ তথা ক্রোধলেশশূণ্য হওয়তঃ সন্নিষ্ঠার দ্বারা সদাত্মারূপী আমাকে আশ্রয় করিয়া অনেকেই জ্ঞান ও তপস্যাযোগে পবিত্র হইয়া আমার সঙ্গে একীভূত হইয়াছেন। তাঁহারাই জানিতে পারিয়াছেন যে আমি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও প্রকৃতির গুণ সম্পর্ক শূণ্য হইয়া জগতে কিরূপে আবির্ভূত হই এবং কর্ম্ম করি।

যদি বল যে,—এতদ্রূপ জগদাত্মাস্বরূপ আমাকে জীবগণ কিরূপে আশ্রয় করিবে? তাহার উত্তর শুন। হে পার্থ, মনুষ্যগণ যে রাস্তায় চলুক না কেন আমারি পশ্চাদনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। কারণ সুখ বা শান্তিই, জীবগণের একমাত্র লক্ষ্য। ঐ সুখ, শান্তি হইতে প্রাপ্তব্য। এই শান্তি পূর্ণতার ফলে সংঘটিত হয়। ঐ পূর্ণতাও আবার সদাত্মারূপ প্রজ্ঞাতে যোগযুক্ত হইলেই সম্ভবপর হয়। আমি সেই অব্যয় সদাত্মা। আমাতেই জীবজগৎ কল্পিত রহিয়াছে। তবেই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে যে ভাবেই লাভ করে আমি সেইভাবে তাহাকে ভজনা করি। রাজ্য, ধন, আত্মীয়স্বজন, পৌরুষ, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি ইত্যাদি সকলই জীবগণের জন্যই কল্পিত এবং আমি ঐ সকলের মূলে সদাত্মারূপে অবস্থান করিয়া সুখ বিধান করি। যথা, মনুষ্যগণ কর্ম্মের সিদ্ধি আকাঙ্খা করিয়া দেবতাবিশেষের অর্চ্চনা করে, কারণ এই জগতে কর্ম্মের সিদ্ধি অতি শীঘ্রই লাভ হয়। ঐ দেবগণের আত্মাও আমাকে জানিবে। ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বণ্য গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারেই আমিই রচনা করিয়াছি। ঐ চাতুর্ব্বণ্যের কর্ত্তাও আমি। কিন্তু তথাপি আমি অবিকারী ও অকর্ত্তা, ইহাই জানিও। কর্ম্মসকল আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না। কর্ম্মফলেও আমার স্পৃহা নাই। এতদ্রূপে আমাকে যিনি জানেন, তিনিও কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়েন না। পূর্ব্বকালেও মোক্ষার্থীগণ এই রহস্যটিকে জানিয়া কর্ম্ম আচরণ করিয়া গিয়াছেন। তেমনিই

তুমিও পূর্ব্ব পূর্ব্বতর আচরিত কর্ম্ম কর।

সেই কর্ম্মতত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি শুন। কর্ম্মকি, তথা সেই কর্ম্ম অকর্ম্মরূপে কিরূপে পরিণত হয় (অর্থাৎ করিয়াও না করার সদৃশ, ফলে বদ্ধ না হওয়া) এতদ্বিষয়ে জ্ঞানীগণও তত্ত্বাবধারণে সক্ষম না হইয়া মুগ্ধ হয়েন। আমি সেই কর্ম্মতত্ত্ব তোমাকে বলিব—যদ্দ্বারা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। যদি তুমি স্মৃতি বা নীতি তথা বেদের অনুশাসন অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা কর তবে তোমাকে বিহিত কর্ম্ম, অবিহিত কর্ম্ম তথা অকর্ম্ম (কর্ম্মশূণ্যতা) এই তিনটিরই জ্ঞান লাভ অবশ্যই করিতে হইবে। অধিকন্তু কর্ম্মের গতিও দুর্জ্ঞেয়। সেই দুর্জ্ঞেয় কর্ম্মগতির জ্ঞানলাভ সহজসাধ্য হইতেই পারে না। তাই এইটি শুধু জানিয়া রাখ যে—কর্ম্মেতে যিনি কর্ম্মশূণ্যতা দেখেন তথা যিনি কর্ম্মশূণ্যতায় কর্ম্মকে দেখেন, মনুষ্যগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান এবং তিনিই প্রজ্ঞাযুক্ত তথা সর্ব্বকর্ম্মকারী।—যাঁহার সমস্ত কর্ম্মই কাম সংকল্পশূণ্য, সেই জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ কর্ম্মা ব্যক্তিকেই, বুদ্ধিমানেরা পণ্ডিত বলেন। সেই পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ করতঃ সদা সন্তুষ্ট চিত্তে নিরাবলম্ব থাকিয়া কর্ম্মে পুনঃ পুনঃ রত থাকিয়াও কিছুই করেন না নিষ্কাম সংযত চিত্তেন্দ্রিয় ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে ভোগপোকরণ সংগ্রহে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহার্থে নিষ্কাম কর্ম্ম করতঃ পাপ ভাগী হয়েন না। যদৃচ্ছা-লাভে সন্তুষ্ট, সুখদুঃখে সমচিত্ত, পরশ্রীকাতরতাশূণ্য, সিদ্ধি ও

অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি ব্যক্তি, কর্ম্ম করিয়াও বন্ধন প্রাপ্ত হয়েন না। ফলাসক্তি বর্জ্জিত, রাগদ্বেষমুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীর যজ্ঞার্থে আচরিত কর্ম্ম নিঃশেষে লয় প্রাপ্ত হয়।

যজ্ঞার্থে কর্ম্ম কিরূপে লয় প্রাপ্ত হয় তাহা বলিতেছি শুন। ব্রহ্মে লীন হইবার জন্য যোগীজন সমাধি যোগের অভ্যাস করতঃ ব্রহ্ম ধ্যান যোগরূপ অর্পণ সময়ে জীবাত্মারূপ ব্রহ্মহবিকে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নিতে ব্রহ্ম চৈতন্যরূপ পুরুষ দ্বারা অর্পিত হইয়া ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিযোগে ব্রহ্মেই প্রবেশ করিয়া কর্ম্মাদিসহ আত্মচৈতন্যের লয় সাধন করেন। আবার অপর কোনও যোগীগণ কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞাদির দ্বারা মন্ত্রস্ফুট ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করেন। পক্ষান্তরে, অপর কেহ কেহ শুদ্ধ চৈতন্যের আশ্রয়ে ব্রহ্মে আত্মার একীকরণরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। অন্য কেহ কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকল সংযমরূপ অগ্নিতে হোম করেন, অর্থাৎ বিষয় না গ্রহণরূপ সংযম অভ্যাস করেন। আবার অপর কোনও কোনও যোগী ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়াও চিত্তের একতানতা নিবন্ধন ইন্দ্রিয় সম্পর্কহীন থাকেন। তাঁহাদেরই ভোগ্য বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয় সংস্পর্শমাত্র হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়, চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হয় না। অপর কোন কোনও যোগী সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম এবং প্রাণকর্ম্মগুলিকে আত্মসংযম ফলে শুদ্ধ চৈতন্য সত্বায় উদ্ভাসিত যোগাগ্নিতে আহুতি দেন

অর্থাৎ ব্রহ্মসাজুয্য লাভ করতঃ কোন কর্ম্মেই লিপ্ত হয়েন না। পক্ষান্তরে, অপর কেহ কেহ অপানে প্রাণকে রেচন করতঃ পুনঃ প্রাণে অপানকে পূরণ করিয়া, প্রাণ ও অপানের গতি বিচ্ছেদ সাধনে প্রাণায়াম পরায়ণ হয়েন। আবার অন্য কেহ কেহ নিয়তাহারী হইয়া (অর্থাৎ আহার সংযম করতঃ) প্রাণসমূহ প্রাণেই আহুতি দেন, অর্থাৎ সমাহিত হয়েন। ইহারা সকলেই যজ্ঞবিৎ এবং যজ্ঞদ্বারা পূত পাপ হইয়াছেন। যজ্ঞ-কারীগণের মধ্যে কেহ কেহ দ্রব্যযজ্ঞকারী, অর্থাৎ দানযজ্ঞে অনুরক্ত। কেহ বা তপোযজ্ঞকারী, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ কৃচ্ছ্র ব্রতধারণকারী। কেহ কেহ যোগযজ্ঞকারী অর্থাৎ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগে অনুরক্ত। আবার কেহ কেহ অধ্যাত্মজ্ঞান বিদ্যার চর্চ্চা করেন।

এইরূপে তীব্র দৃঢ়ব্রতী তথা দৃঢ় সংকল্প যতিগণ যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতভোজী হইয়া সনাতন ব্রহ্মেই প্রবেশ করেন।—যজ্ঞবিহীনের ইহলোকই নাই—হে অর্জ্জুন! আবার অন্য-লোকপ্রাপ্তি কি করিয়া সম্ভবিবে? এই প্রকারের অনেকানেক যজ্ঞ, ব্রহ্মে প্রবেশ করিবার পথস্বরূপে কল্পিত আছে। সেই সেই যজ্ঞসকলও কর্ম্ম হইতে জাত, ইহা জানিও। এই কর্ম্ম-জাত যজ্ঞসকলকে জানিয়া মুক্তি লাভে সমর্থ হইবে। হে পরন্তপ, দ্রব্যময় কর্ম্মযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠতর, যেহেতু হে পার্থ, বিশ্বের সকল কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে। হে অর্জ্জুন, যে জ্ঞানে বিশ্বকর্ম্মের পরিসমাপ্তি ঘটে, সেই জ্ঞান

তুমি তত্ত্বদর্শীগণকে প্রণাম এবং সেবা করতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসুরূপে প্রশ্নদ্বারা লাভ করিতে প্রযত্ন কর। তাঁহারা তোমাকে উপদেশ করিবেন। হে পাণ্ডব, যাহা জানিয়া তুমি আর কখনও এরূপ মোহগ্রস্ত হইবে না। অধিকন্তু, যে জ্ঞান দ্বারা তুমি চরাচর বিশ্বকে নিজ আত্মায় দেখিতে পাইয়া ব্রহ্মযোগযুক্ত হওয়তঃ আমাতেও দর্শন করিতে সক্ষম হইবে। অর্থাৎ সৎকর্ম্মরূপ যজ্ঞ দ্বারা শোধিত চিত্ত বিশুদ্ধ চিৎ সত্ত্বায় অবস্থান করতঃ সমস্ত ভূতবর্গকে আত্মমধ্যে দর্শন করিয়া পরে আত্মাকেও আমাতে দেখিবে। যদি বল যে সর্ব্বথা নিষ্পাপ ব্যক্তিই এতদ্রূপ অবস্থা লাভ করিতে সক্ষম, তদ্ব্যতিরেকে উক্ত জ্ঞান লাভ সম্ভবপর নহে। কিন্তু আমি বলিতেছি যে, সকল পাপীগণ হইতেও যদি তুমি মহা পাপিষ্ঠ হও, তবু সকল পাপ সমুদ্র একমাত্র জ্ঞানতরণীর সাহায্যে উত্তীর্ণ হইবে। শঙ্কা করিওনা যে কিরূপে হইবে। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে তদ্রূপে জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মসমূহকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে। যোগে সম্যক সিদ্ধিলাভ করতঃ সেই জ্ঞান কালক্রমে আত্মাতে স্বয়ংই লব্ধ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাবান আত্মজ্ঞান নিরত জিতেন্দ্রিয় পুরুষই জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরেই ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হয়েন। অজ্ঞ শ্রদ্ধাহীন, সংশয়ী আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক, পরলোক বা সুখ কিছুই নাই। হে ধনঞ্জয়! যোগদ্বারা সংন্যস্তকর্ম্মা, জ্ঞান দ্বারা সংচ্ছিন্নসংশয়,

আত্মবান যোগীকে কর্ম্মসকল আবদ্ধ করে না। তাই তুমি হৃদয়স্থ অজ্ঞানসম্ভূত এই সংশয়কে আত্মজ্ঞানরূপী খড়্গ দ্বারা ছেদন করতঃ যোগাবলম্বন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াও।

পঞ্চম অধ্যায়—(কর্ম্ম সন্ন্যাস যোগ)

অর্জ্জুনের শঙ্কা হইল তাই প্রশ্ন করিলেন যে—হে কৃষ্ণ, তুমি কর্ম্মের সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ এবং যোগ অর্থাৎ কর্ম্ম-করা, এই দুইটি বিরুদ্ধবাক্য একই সময়ে বলিতেছ; আমাকে এই উভয়ের মধ্যে যেটি শ্রেয়ঃসাধন তাহাই সুনিশ্চিত ভাবে বল। শ্রীভগবান বলিলেন যে—সন্ন্যাস তথা কর্ম্মযোগ, উভয়েই মোক্ষপ্রদ হইলেও কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। হে মহাবাহো, যিনি দ্বেষ বা আকাঙ্খা কিছুই করেন না, তাঁহাকেই নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। কারণ দ্বন্দ্ব-রহিত ব্যক্তিই সুখে মুক্তি লাভ করেন। অজ্ঞ ব্যক্তিরা সাংখ্য (সম্যকরূপে তত্ত্ব প্রকাশিকা জ্ঞান) এবং যোগ (তত্ত্বে অবস্থিতি) এই দুটিকে পৃথক বলে। পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন না। এই দুইটির কোনটিতে অধিষ্ঠিত হইলে উভয়ের ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞাননিষ্টগণ কর্ত্তৃক যে স্থান লব্ধ হইয়া থাকে, কর্ম্মযোগীগণ দ্বারাও সেই স্থানই লব্ধ হয়। জ্ঞাননিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠাকে যে ব্যক্তি এক বলিয়া জানেন

তিনি তত্ত্বদর্শী। অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম্মকে ছাড়িয়া নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না; বা জ্ঞানকে ছাড়িয়া কর্ম্মযোগও নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না। অঙ্গাঙ্গীভাবে উভয়েই উভয়ের মধ্যে অবস্থান করে। হে মহাবাহো, কর্ম্মযোগ সম্পর্কশূন্য কেবলমাত্র জ্ঞানাশ্রয়ে সংন্যাস (সম্যক ত্যাগ) দুঃখ প্রাপ্তির নিমিত্তই হয়। অর্থাৎ নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দেহযাত্রাও অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। কিন্তু যোগযুক্ত মননশীল মুনি কর্ম্মযোগে রত থাকিয়াও অগৌনেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয়, জিত-প্রাণ, জিতচিত্ত হইয়া যিনি যোগযুক্ত আছেন, সেই সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপে অধিষ্ঠিত আত্মা, কর্ম্ম করিয়াও ফলাফলে লিপ্ত হয়েন না। কর্ম্মযোগে যুক্ত তত্ত্বদর্শী পুরুষ (আত্মতত্ত্ববিৎ) ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি গ্রহণ করিয়াও—"ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করিতেছে, আমি নির্লিপ্ত দ্রষ্টাস্বরূপে আত্মা" এতদ্রূপ ধারণা করিয়া, "আমি কিছুই করি না" ইহা বোধ করেন। কর্ম্মসকল ব্রহ্মে স্থাপন করতঃ যিনি ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন, তিনি জলস্থিত পদ্মপত্রের ন্যায় কর্ম্মের পাপ পূণ্যে লিপ্ত হয়েন না। প্রকৃতি পুরুষের লীলার জন্য সয়ম্ভূ ব্রহ্মা যে লীলাচিত্র কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মকর্ম্ম ভগবৎ প্রীতির নিমিত্ত হউক —এইভাবে কর্ম্ম করাকেই ব্রহ্মে সংন্যস্ত কর্ম্ম বলা হয়। যোগীগণ ফলাসক্তি বর্জ্জন করতঃ আত্মশুদ্ধির জন্য (অর্থাৎ

প্রতিকূল সংস্কারসমূহ দগ্ধ করিবার নিমিত্ত) শরীর, মন তথা বিষয়ভোগবিমুখ ইন্দ্রিয় নিচয়ের দ্বারা কর্ম্ম করেন। কর্ম্ম-যোগে যুক্ত পুরুষ কর্ম্মফলে উদাসীন থাকিয়া চাঞ্চল্যরহিত শান্ত আত্মায় অবস্থান করতঃ শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে অযোগী অর্থাৎ কর্ম্মবিহীন পুরুষ কামনা হেতু কর্ম্ম-ফলে আসক্ত হইয়া বদ্ধ থাকে। জিতেন্দ্রিয়, জিতপ্রাণ, জিতচিত্ত বশীদেহী (পুরুষ) মনদ্বারা সকল কর্ম্মই গচ্ছিত রাখিয়া (অর্থাৎ ইহা ব্রহ্মের কর্ম্ম এই দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধির দ্বারা শ্রীভগবৎ লীলারূপী কর্ম্ম হইতেছে জানিয়া, "তাহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক"—এইভাবে কর্ম্মফলাফল তদুদ্দেশ্যে সমর্পিত বা সংন্যস্ত করিয়া) নবদ্বারযুক্ত এই দেহে নিজেও কিছু করেন না বা অপরের দ্বারাও কিছু করান না—এইরূপে সুখে অবস্থান করেন। প্রভু (জগৎস্বামী) লোকের কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মসমূহ সৃজন করেন না তথা কর্ম্মের ফল সংযোগও করেন না। কিন্তু স্বভাবতই উহা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইচ্ছারূপে; জ্ঞানরূপে কর্ম্মরূপে প্রকৃতিই প্রবৃত্তা হয়েন। যাঁহার আশ্রয়ে প্রকৃতি প্রবৃত্তা হয়েন, সেই বিভু কাহারও পাপপুণ্যাদি গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান তমে জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকাতেই—প্রাণীগণ মোহিত হয়। কিন্তু যাঁহাদিগের সেই অজ্ঞান তমঃ আত্মজ্ঞান দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে, তাঁহাদিগের সূর্য্যোজ্জ্বল সেই জ্ঞান পরমাত্মাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। পরমাত্মজ্ঞানী, পরমাত্মযোগী

পরমাত্মরতিবিশিষ্ট মহাত্মাগণ, জ্ঞান দ্বারা পাপ বা পূণ্যের সংস্কার বিধৌত হইয়া সংসারে পুর্ণজন্ম প্রাপ্ত হয়েন না। পরমাত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে, কুক্কুরভোজী চণ্ডালে, গো, হস্তী, ও কুক্কুরে সমদর্শী হয়েন। যাঁহাদিগের মন সাম্যে অবস্থিত, এই মর্ত্তলোকেই তাঁহাদিগের দ্বারা সৃষ্টির আবর্ত্ত জিত হইয়াছে। যেহেতু ব্রহ্মই নির্দ্দোষ তথা সম, অতএব তাঁহারাও ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিয়াছেন। বৈষম্য ত্যাগে বুদ্ধি স্থির হওয়তঃ মোহশূন্যাবস্থায় ব্রহ্মে স্থিতি লাভে কৃতকৃত্য হওয়তঃ প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুপ্রাপ্তিতে হৃষ্ট বা উদ্বিগ্ন হয়েন না। শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ে অনাসক্ত আত্মা স্বীয় আত্মাতে যে সুখ প্রাপ্ত হয়েন তিনিই ব্রহ্মে যোগযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখলাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শরিরী মাত্রেই নিরবিচ্ছন্ন সুখভোগে সমর্থ হইতে পারে না, ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা হইয়াই উহা লাভ করিতে হয়। ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে উদ্ভূত যে সুখ, তাহা দুঃখেরই প্রকারভেদ মাত্র। সেই উৎপত্তি বিনাশশীল বিষয়সমূহে জ্ঞানীগণ প্রীতিলাভ করেন না। যিনি শরীর ত্যাগের পূর্ব্বেই এই দেহে কামক্রোধদ্ভূত বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী পুরুষ। যিনি অন্তরাত্মাতেই সুখী, অন্তরাত্মাতেই যাঁহার স্থিতি এবং যাঁহার অন্তরাত্মা প্রকাশময়, সেই যোগী ব্রহ্মে লয় হইয়া ব্রহ্মেই মিলিত হয়েন, অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। নিষ্পাপ, সংশয়শূন্য, সমাহিতচিত্ত, সর্ব্বজীবের হিতসাধনে

রত ঋষিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। কামক্রোধমুক্ত সংযতচিত্ত আত্মজ্ঞানী ঋষিগণের চতুর্দ্দিকেই ব্রহ্মসাযুজ্য বর্ত্তমান আছে, অর্থাৎ তাঁহারা সদাই মুক্তস্বরূপে অবস্থিতি করেন। বাহ্য বিষয়সমূহকে চিত্ত হইতে বিদূরিত করিয়া নেত্রদ্বয় ভ্রূযুগল মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করতঃ নাসাভ্যন্তরস্থ প্রাণ ও আপন বায়ুকে একীকরনান্তর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত রাখিয়া মোক্ষপরায়ণ মনে যিনি ইচ্ছা, ভয় তথা ক্রোধ ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই সদামুক্ত। সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার লক্ষ্যস্থলীভূত অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা তথা ফলদাতা, সর্ব্বভূতের হিত-চিন্তাকারী এবং সর্ব্বলোক মহেশ্বর যে আমি, সেই আমাকে জানিয়া শান্তিলাভ হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়—(অভ্যাস যোগ)

অর্জ্জুনের মনে শঙ্কা হইল—তবেই ত' তুমি কর্ম্মসন্ন্যাসের কথাই বলিতেছ। সমস্ত বহির্বিষয়ে বিমুখ হইয়া চক্ষুর্দ্বয় পর্য্যন্ত ভ্রূবন্তবে নিবিষ্ট করতঃ প্রাণাপানের গতি নিশ্চল করিয়া, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি রুদ্ধাবস্থায় অন্তর্নিবিষ্টচিত্তে ইচ্ছা ভয় ক্রোধ ত্যাগ দিয়া, সংসার সম্বন্ধ জনিত আসক্তি ও মোহের কবল মুক্ত হইতে হইবে; অতঃপর তোমাকে জানিতে পারিয়া শান্তি লাভ হইবে। এতদবস্থায় আবার যুদ্ধাদি কর্ম্মযোগ

কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জ্জুন, এ বিষয়ে তুমি সন্দেহ করিও না যে—কর্ম্ম সংন্যস্ত হইলে, আবার কর্ম্মযোগের সম্ভাবনা কেমন করিয়া থাকিবে। দেখ যে ব্যক্তি কর্ম্মফলাপেক্ষা না করিয়া কর্ম্ম কর্ত্তব্যজ্ঞানে করে, সেই সন্ন্যাসী এবং যোগী। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞত্যাগী অথবা নিয়ত স্বভাবজ কর্ম্মত্যাগীকে সন্ন্যাসী বলা যায় না। হে পাণ্ডব, যাহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহাকেই যোগী বলিয়া জানিও—কারণ, সংকল্প ত্যাগ না করিয়া কেহই যোগী হইতে পারে না। [কর্ম্মফল ত্যাগ হইতেই সন্ন্যাস সিদ্ধ হয়। যোগ ব্যতীত অহংবুদ্ধিজাত সংকল্পের সন্ন্যাস, ফলদায়ক ত' নহেই বরং দুঃখেরই নিমিত্ত স্বরূপ মাত্র।] তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে—যোগ আরোহণেচ্ছু মুণির কর্ম্মই সাধ্য সাধন। পরন্তু, সেই ব্যক্তি যোগে আরূঢ় হইলে পর সংকল্প ত্যাগ করতঃ চিত্তের শমতাভ্যাসই সাধনস্বরূপে কল্পিত হয়। এতদ্রূপে অভ্যস্থ হইলে যখন মন, ইন্দ্রিয়বিষয়ে বাধিত হইবে না বা ইন্দ্রিয়েরও বিষয় প্রাপ্তিরূপ চেষ্টাতে আসক্তি হইবে না, তখনই সর্ব্ব সংকল্পত্যাগী সন্ন্যাসী যোগারূঢ় বলা যাইতে পারিবে। এখন অর্জ্জুন ভাবিতেছেন যে—তিনি যোগারূঢ় হইলেও মনের এবং দেহান্দ্রিয়ের কার্য্য সমানভাবে চলিতে থাকিবে। উহারা প্রকৃতির দ্বারাই চালিত হইবে; কেবল তিনি অনাসক্ত মাত্র থাকিবেন। তদপেক্ষা তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় থাকায়ই বা দোষ কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—

যদি প্রাকৃতির লীলা চলিতেই থাকিবে, তুমি প্রাকৃত দেহ, বুদ্ধি, মন দ্বারা কিরূপে আত্মোন্নয়ন করিবে তাহা শঙ্কা করিও না এখানে কথাই হইতেছে যে তুমি বর্ত্তমানে অবসন্ন হইয়া দুঃখ পাইতেছ, এই দুঃখের চির অবসান জন্যই তোমাকে যোগারূঢ় হইতে হইবে।

যদি বল, সব যন্ত্রই প্রকৃতির হাতে রহিয়াছে—তোমার সাধ্য কি? তদুত্তরে শুন—আত্মজ্ঞান মাত্র সহায় করিয়া তুমি আত্মোন্নয়ন কর, আত্মাকে অবসন্ন করিও না। আত্মার আত্মাই বন্ধু, তথা আত্মাই আত্মার রিপু। যে আত্মা, আত্মজ্ঞান সহায়ে আত্মাকে জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। পক্ষান্তরে, অজিতাত্মার আত্মাই শত্রুবৎ শত্রুতা করিয়া থাকে। আত্মা জিত হইলে প্রশান্ত হওয়তঃ পরমাত্মার সারূপ্য লাভ করে এবং শীতোষ্ণ সুখদুঃখ রূপ দ্বন্দ্বে সমাহিত থাকে। অনাত্ম বিষয়ে বিজ্ঞান তথা আত্মবিষয়ে জ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত আত্মা, অন্তর্নিবিষ্ট, জিতেন্দ্রিয়, তথা পাষাণ এবং কাঞ্চনে লোষ্ট্রসমদৃষ্টিসম্পন্ন যোগীকেই যুক্ত বলা যায়। তন্মধ্যে আবার সুহৃদ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধুতে তথা সাধু এবং পাপী ব্যক্তিতে সমজ্ঞান সম্পন্ন যোগী বিশিষ্ট হয়েন। যোগী নির্জ্জনে অবস্থান করতঃ একাকী চিত্তকে আত্মাতে সংযত রাখিয়া নিরাকাঙ্খী হওয়তঃ সঞ্চয়বুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক নিরন্তর আত্মযোগ অভ্যাস করিবেন। নাতিউচ্চ নাতিনীচ পবিত্রস্থানে কুশোপরি অজিন তদুপরি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা

স্বীয় আসন স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠা করতঃ আসীন হইয়া, তথা ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য হইতে বিরত হওয়তঃ মনকে একাগ্র করিয়া আত্মশুদ্ধি হেতু যোগাভ্যাস করিবেন। শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সম (দণ্ডবৎ সমসূত্রে সরল) তথা অচলভাবে রাখিয়া, স্থিরতার সহিত স্বীয় নাসাগ্রস্থ আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতঃ দিগন্তরে অবলোকন না করিয়া, প্রশান্ত চিত্তে, নির্ভীক তথা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী হওয়তঃ মৎগত চিত্ত হইয়া, মন সংযম করতঃ মৎপরায়ণ হইয়া যোগযুক্ত হইবেন। যোগী উক্ত প্রকারে নিরন্তর আত্মযোগাভ্যাসে রত থাকিয়া নির্ব্বাণের পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন, অতিভোজন বা অতি অনাহার, অতি নিদ্রা বা অতি জাগরণশীলগণ যোগ প্রাপ্তি করিতে পারেন না। পরিমিত আহার, বিহার (ভ্রমণাদি স্বাভাবিক ব্যায়াম) যুক্তিযুক্ত কর্ম্মে চেষ্টাশীল, পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণশীলেরই যোগ ক্লেশ নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। যখন বিশেষভাবে নিরুদ্ধ চিত্ত আত্মাতেই অবস্থিতি করে, তখনই সকল কামকামনা হইতে নিস্পৃহ হইয়া যোগযুক্ত হইল—বলা যাইতে পারে। নির্ব্বাতস্থিত দীপ যেমন চঞ্চল হয় না,—আত্মযোগাভ্যাসী যোগীর সংযত চিত্তের উহাই উপমা জানিবে। যেখানে যোগ অভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত উপরত (বৃত্তিশূণ্য) হয় এবং যে অবস্থায় আত্মার দ্বারা আত্মাকে আত্মাতেই দেখিয়া পরিতুষ্ট হয় : এবং যেখানে আত্মা (চিত্ত) বুদ্ধিমাত্র দ্বারা গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর আত্যন্তিক যে সুখ

তাহা অনুভব কারন, তথা যে অবস্থায় স্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হয়েন না; যাহাকে লাভ করিয়া অপর কোনও লাভকে ততোধিক বলিয়া বোধ করেন না, এবং যাহাতে স্থিত হইয়া মহাদুঃখেও বিচলিত হয়েন না—সেই দুঃখ সংযোগের বিয়োগরূপ অবস্থাকেই যোগ বলিয়া জানিবে। নির্ব্বেদ (ক্লান্তিবোধ, অবসন্নতা) শূণ্য চিত্তে ও অধ্যবসায় সহকারে সেই যোগ অভ্যাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সংকল্পজাত কামনাকে নিঃশেষিতরূপে ত্যাগ করিয়া মনকে আত্মাতে যুক্ত করিয়া অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। এইরূপে ধীরে ধীরে অভ্যাস করিবে। কারণ প্রশান্ত (অবাধ) চিত্ত তথা বীতরাগ নিষ্পাপ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত, এই যোগীকেই ব্রহ্মানন্দ সুখ আশ্রয় করিয়া থাকে। এইরূপে নিরন্তর আত্মযোগাভ্যাস করিতে করিতে যোগী নিষ্পাপ হওয়তঃ অনায়াসে ব্রহ্ম-সংস্পর্শঃ জনিত নিরতিশয় সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যোগ দ্বারা পরমাত্মাতে যুক্ত যোগী সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতে তথা সর্ব্বভূতবর্গকে আত্মাতে দর্শন করেন। যে যোগী আমাকে সর্ব্বত্র দেখেন তথা সকল বিশ্বজগৎ আমাতে দেখেন—আমি তাঁহার দৃষ্টির অন্তরালে হইনা, তিনিও আমার দৃষ্টির অন্তরালে থাকেন না। যিনি সমষ্টি আত্মা-রূপী আমাতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করতঃ সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন, যে কোনও অবস্থায় থাকিয়াও সেই যোগী আমাতেই অবস্থান করেন। হে অর্জ্জুন, আত্মতুলনার দ্বারা

(অর্থাৎ আমিই আত্মস্বরূপে সর্ব্বভূতে আছি—এই জ্ঞানে) সর্ব্বভূতে যিনি সুখ বা দুঃখকে তুল্যভাবে দর্শন করেন, সেই যোগীই সকলের শ্রেষ্ঠ—ইহাই আমার অভিমত।

চিত্তের নিরোধ পরিণাম বিষয়ে সম্যকজ্ঞান লাভ করিয়াও চিত্তের সাম্যাবস্থায় অবিচ্ছেদে স্থিতি বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন যে,—হে মধুসূদন! তুমি যে সাম্য-যোগের উপদেশ করিলে, চিত্তচাঞ্চল্য হেতু ইহার (চিত্ত সাম্যের) স্থায়ী বিদ্যমানতা আমি মোটেই দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ! যেহেতু মন স্বভাবতই চঞ্চল, ইন্দ্রিয়ক্ষোভকারী, শক্তিশালী তথা অনমনীয়—আমি ত' সেই মনের নিগ্রহকে বায়ুর ন্যায়ই দুঃসাধ্য মনে করি। শ্রীভগবান বলিলেন—হে মহাবাহো! মন দুর্বিরোধ্য তথা চঞ্চল, ইহাতে সংশয় নাই। পরন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য (অনাসক্তি) দ্বারা আয়ত্তীভূত হয়। অসংযত চিত্তেন্দ্রিয় দ্বারা যোগ লাভ হয় না—ইহাই আমার অভিমত। পরন্তু, সংযতেন্দ্রিয় চিত্ত দ্বারা বিধিপূর্ব্বক যত্নশীল বশীদেহ কর্ত্তৃক যোগ লভ্য হয়।

অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধাসহকারে প্রবৃত্ত কিন্তু অযতি (সংযমহীন,) যোগ হইতে (আত্মতত্ত্ব হইতে) ভ্রষ্ট হইয়া (ভোগাসক্তিতে মজিয়া) যোগ সংসিদ্ধি লাভ না করিয়া কোন গতি প্রাপ্ত হয়? ইহাতে কি ঐ ব্যক্তির ছিন্নমেঘখণ্ডের ন্যায় উভয় কূলই নষ্ট হইল না? অর্থাৎ যোগ-সিদ্ধির ফলস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ ত' লাভ হইলই না পক্ষান্তরে বৈদিক

স্বর্গসুখ হেতু ভূত কাম্যকর্ম্মের ফলও সংঘটিত হইল না। যে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয় নিঃশেষে ছেদন করিতে একমাত্র তুমি যোগ্য, তুমি ভিন্ন এই সংশয়ের নিরশনকারী অপর কেহই নাই। শ্রীভগবান বলিলেন—হে পার্থ, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে বা পরলোকে কুত্রাপি বিনাশ নাই। কারণ হে তাত! শুভকর্ম্মকারী কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হয়েন না। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্য লোকসকল প্রাপ্তি করতঃ তথায় বহুকাল বাস করিয়া সদাচারবিশিষ্ট ধনীগৃহে জন্মিয়া থাকেন। এইরূপ যে জন্ম, লোকে ইহাও দুর্লভতর। হে কুরুনন্দ! সেই জন্মে, পূর্ব্বদেহজাত সেই যোগনিষ্টার বুদ্ধি লাভ করেন, তদনন্তর পুনরায় যোগ-সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করেন। সেই যোগী পুনর্ব্বার পুর্ব্বাভ্যাস দ্বারা চালিত হইয়াই, অবশপ্রায় (নিজ অজ্ঞাতেই) যোগ-মার্গে নীত হন। যদি বল যে, অক্ষর ব্রহ্মনিষ্ঠা যাহা একমাত্র জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্য, সেই জ্ঞান লাভের উপায়ীভূত বেদোক্ত যজ্ঞ-কর্ম্মাদি ব্যতিরেকেই, কি করিয়া যোগাচরণ দ্বারা চিৎব্রহ্মে যুক্ত হইয়া আত্মস্থ হইতে সক্ষম হইবেন? তদুত্তরে শুন এই যে, যোগের জিজ্ঞাসু মাত্রকেই, শব্দব্রহ্মের (বেদের) পারগামী বলিয়া জানিও। পূর্ব্ব জন্মকৃত যত্ন হইতেও অধিকতর যত্ন করতঃ যোগাভ্যাসে নিষ্পাপ হইয়া যোগী অনেক জন্মে সম্যকরূপে সিদ্ধ হইয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। যোগী তপস্বীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—ইহাই আমার মত। হে অর্জ্জুন, তাই তুমি

যোগী হ'ও। সকল যোগীগণের মধ্যেও যিনি মদ্গতচিত্ত দ্বারা শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়তঃ আমাকে ভজনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠতম যোগী, ইহাই আমার মত।

সপ্তম অধ্যায় (জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ)

নিরুদ্ধচিত্তে আত্মদর্শনের পরেই সমষ্টি আত্মা অর্থাৎ শ্রীভগবানের, উপাসনা করিয়া সাম্য লাভ করিতে হয় এখন এই অধ্যায়ে সেই সমষ্টিরূপের বর্ণনা সুরু হইতেছে। শ্রীভগবান বলিলেন,—হে পার্থ, আমাতে অনুরক্তচিত্ত হইয়া আমাকে আশ্রয় করতঃ যোগাভ্যাস দ্বারা সমগ্র বিভূতি, বল, ঐশ্বর্য্য সমন্বিত আমাকে নিঃশংসয়িতরূপে যেভাবে জানিতে পারিবে তাহা শ্রবণ কর। আমি তোমাকে অনুভাব্য জ্ঞান সম্যক প্রকারে বলিতেছি। যাহা জানিয়া ইহ বা পরলোকে বাকি কিছুই থাকিবে না। সহস্র সহস্র মনুষ্যগণ মধ্যেও কোনও এক ব্যক্তি চিত্তের বৃত্তি সমাধান কল্পে যত্ন করেন, আবার সেই যত্নশীল সিদ্ধগণের মধ্যেও কদাচিৎ কেহ (যোগী) আমাকে স্বরূপতঃ জানেন। (অর্থাৎ) ব্যষ্টিতে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াও সমষ্টিরূপে আমাকে কদাচিৎই কেহ জানিতে পারেন।

ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই

আটটি আমার মূল প্রকৃতি হইতে ভিন্ন জানিবে। ইহাদের নাম অপরা প্রকৃতি। আমার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিই হইতেছে, জীবস্বরূপা— উহা এই অপরা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, যাহাদ্বারা জগৎ (অপরা-প্রকৃতি) ধৃত রহিয়াছে। এই চেতনাত্মিকা জীবভূতা পরাপ্রকৃতি এবং অচেতনা অপরানামা প্রকৃতি—এই দুইটিই সর্ব্বভূতের যোনি স্বরূপা জানিবে। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তির এবং লয়ের কারণ আমিই। হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোথাও কিছুই নাই। আমাতেই এই সমগ্র বিশ্ব সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় বিরাজিত আছে। দেখ, এই যে জলে রস, শশীসূর্য্যে প্রভা, সর্ব্ববেদে প্রণব, আকাশে শব্দ, মানবে পৌরুষ, পৃথিবীতে সৎগন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্ব্বভূতে জীবন, তপস্বীতে তপস্যা—এই সকলই আমি। বরং আমাকে সর্ব্বভূতের বীজ স্বরূপই জান। বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি এবং তেজস্বীগণের তেজও আমি। বলবানগণের কামরাগবর্জ্জিত বলও আমি। হে ভরতর্ষভ! ভূতবর্গে ধর্ম্মের অপ্রতিকূল কামও আমি (অর্থাৎ জৈবধর্ম্মের পতনের হেতুভূত কাম আমি নহি)। এতদ্ব্যতীত সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক যে সকল ভাব আছে, ঐ সকল আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও, আমি কিন্তু ঐ সকল ভাবেতে থাকি না। বরং তাহারাই আমাতে আছে। সমগ্র বিশ্ব উক্ত গুণত্রয়ের ভাবদ্বারা মোহিত হইয়া গুণাতীত, অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না। এই যে আমার দৈবী গুণময়ী মায়া (প্রকৃতি) ইহা দুরতিক্রম্যা।

কিন্তু আমাকে লাভ করিলে এই প্রকৃতিকে অতিক্রম করা যায়। মায়া দ্বারা জ্ঞানহারা দুষ্কৃত মূঢ় নরাধমেরা আসুর-ভাবকে আশ্রয় করতঃ আমাকে লাভ করিতে পারে না।

চারি প্রকার পুণ্যশীল ব্যক্তিগণই আমাকে ভজনা করেন ঃ—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। তাহাদের মধ্যেও একভক্তি নিত্যযুক্ত জ্ঞানী (অর্থাৎ আমিই সর্ব্বমূল-কারণাশ্রয় এই বোধে আমাকে ভজনা করতঃ সদা আমাতেই নিবিষ্টচিত্ত) ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠতম। যেহেতু জ্ঞানীর আমিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম এবং সেও আমার প্রিয়। উপরোক্ত অপর তিন প্রকারের ভক্তগণও শ্রেষ্ঠ—কিন্তু জ্ঞানীকে আমার আত্মার স্বরূপই মনে করি, কারণ সেই যুক্তাত্মা জ্ঞানী অতি উত্তম গতিস্বরূপ, আমার স্বারূপ্যই লাভ করিয়া থাকেন। বহু জন্ম অন্তে জ্ঞানবান ব্যক্তি আমার ভক্ত হয়েন। বাসুদেবই এই বিশ্বজগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, এইভাবে চিত্তলয়প্রাপ্ত মহাত্মা সুদুর্লভ। (অর্থাৎ বাসুদেবে লয়প্রাপ্ত চিদাত্মা মহাত্মা হয়েন—জগতে এরূপ মহাত্মা বিরল।)

এখানে অর্জ্জুনের মনে শঙ্কা হইল যে, আর্ত্তব্যক্তি বা অর্থার্থী কোনও দেবতাবিশেষের উপাসনা করিয়া যে কৃতকৃত্য হইল, সে ত' তার কাম্য ভোগেই লাগিয়া থাকিবে; জন্ম জন্মান্তরেও কি করিয়া সম্ভব হইবে, তাহার মহাত্মা হওয়া! শ্রীভগবান বলিতেছেন,—আর্ত্তের কাম্যলাভ দ্বারা দুঃখাবসানের কামনা, জিজ্ঞাসুর বুদ্ধি বিবেক লাভ স্বরূপ

শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়ার কামনা, অর্থার্থীর প্রয়োজনসিদ্ধি লাভরূপ কামনা, দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া নিজ নিজ স্বভাব কর্ত্তৃক বশীভূত হওয়তঃ যাঁহার যেরূপে কামনা সিদ্ধি হইতে পারে, তিনি সেই নিয়মে থাকিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে যে যে ভক্ত যে যে মূর্ত্তির উপাসনা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া করিতে ইচ্ছা করে, সেই সেই ভক্তের সেই অচল শ্রদ্ধা আমিই ধিধান করিয়া থাকি। সেই শ্রদ্ধার দ্বারা যুক্ত হইয়াই সে তাহার আরাধনা লাভ করিয়া থাকে এবং সেই আরাধনা হইতে আমাকর্ত্তৃকই বিহিত ঈপ্সিত কাম্য লাভও করে। পরন্তু সেই সকল অল্পবুদ্ধিগণের উক্ত কাম্যফল চিরস্থায়ী হয় না। এইরূপে দেবোপাসকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়েন, পক্ষান্তরে আমার ভক্ত আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ দেবলোকে দেবস্বরূপে থাকিয়া পুণরায় জন্মগ্রহণ করতঃ আমার ভক্ত হয়, এবং এইরূপে অনেক জন্মজন্মান্তরে আমাকে লাভ করে।

অজ্ঞানীরাই প্রকৃতির পরের অত্যুৎকৃষ্ট আমার অব্যয় ভাবকে না জানিয়া অব্যক্তস্বরূপ আমাকে, মূর্ত্তির আকারে ব্যক্ত মনে করে। আমি যোগমায়ার দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকাতে সকলের সমক্ষে প্রকাশিত হইনা। তদ্ধেতুই এই লোক (জগৎ) মুঢ়তাবশতঃ অজ, অব্যয়স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না। হে অর্জ্জুন, আমি অতীত, বর্ত্তমান তথা ভবিষ্যতের সকল প্রাণীকেই জানি। কিন্তু আমাকে কেহই জানে না। হে পরন্তপ ! ভূতসমুহ সৃষ্ট হইয়া ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে

জাত শীতোষ্ণাদি দুই প্রকারের মোহজনক বিরুদ্ধভাব দ্বারা মুগ্ধ হয়। প্রকৃতির দ্বন্দ্ব ভাবে মোহগ্রস্ত হইয়া ইচ্ছার অনুকূলে তথা অনিচ্ছার প্রতিকূলে চলিবার জন্যই চেষ্টান্বিত থাকে। আমাকে জানিবার আগ্রহ বা অবকাশ তাহাদের হয় না। পরন্তু, যে পূণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিগণের পাপক্ষয় (প্রজ্ঞোদয়) হইয়াছে, তাঁহারাই দ্বন্দ্ব মোহশূন্য হইয়া দৃঢ়ব্রতী হওয়তঃ আমার ভজনা করেন। জরামরণ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করতঃ যত্ন করেন, তাঁহারাই সেই ব্রহ্মাকে এবং সমগ্রবিশ্বে প্রবিষ্ট বিশ্বনাথরূপী আত্মাকে তথা সমগ্রবিশ্বের কর্ম্মকে জানেন। যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে জানেন, তাঁহারা আমাতে চিত্তলীন করতঃ মৃত্যুকালেও আমাকে জানিতে পারেন। অর্থাৎ সমাধি-যোগ অভ্যাস ফলে আমাতে যুক্ত থাকিয়া মৃত্যুকালেও অন্য বিষয়ে চিন্তা করেন না, বরং আমাকে দেখিতে দেখিতেই শরীর ত্যাগ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, সারাজীবনের অপূর্ণ কাম্য-বিষয়েই মৃত্যুকালে জীবের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কিন্তু আমি ভূতমধ্যে, দেবমধ্যে এবং যজ্ঞমধ্যে পরিপূর্ণ স্বরূপে অবস্থিত আছি—হেতুই, আমাকে জানিয়া চিত্ত বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হয় না, প্রশান্তই থাকে।

অষ্টম অধ্যায় (অক্ষর—ব্রহ্ম যোগ)

পূর্ব্ব অধ্যায়ের প্রথমেই শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে, সমষ্টি-রূপ তাঁহাকে যে উপায়ে জানিতে পারা যায়, তাহাই বলিবেন। ঐ অধ্যায়ের উপসংহারে বলিলেন যে ব্রহ্ম, সমষ্টিগত আধ্যাত্মিক ভাব, তথা বিশ্বের সকল কর্ম্মকে এবং অধিভূত, অধিদৈব তথা অধিযজ্ঞসহ শ্রীভগবানকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই প্রয়াণ-কালেও যুক্তচিত্তে থাকা হেতু তাঁহাকে বিস্মৃত হন না। এই ছয়টি মূলবিষয়ের জ্ঞান হইলেই সমগ্ররূপ তাঁহাকে (বাসুদেবকে) প্রায়াণকালেও জানা যাইবে। তাই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে—ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? অধিভূত কি? অধি-দৈবত কি? অধিযজ্ঞ কি এবং এই দেহেই বা কি প্রকারে অবস্থিত? প্রয়াণকালেই বা সংযতচেতাগণ দ্বারা তুমি কি প্রকারে জ্ঞাত হও? এই সাতটী প্রশ্নের মীমাংসাচ্ছলে শ্রীভগবান বলিলেন—অক্ষরই ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠতম অবস্থা (অর্থাৎ ইনিই জ্ঞানঘনস্বরূপ)। স্বভাবকেই অধ্যাত্ম বলে (অর্থাৎ চিৎরূপা জ্ঞানময়ী ভাবাশ্রয়ে ব্রহ্মই আত্মস্বরূপে অধ্যাত্ম হয়েন)। ভূতভাবের সৃষ্টির কারণস্বরূপ, বিসর্গকে (ভাবময়ী প্রকৃতিতে ব্রহ্মের বীর্য্যাধানরূপ সংকল্প বা আত্মত্যাগকেই) কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। ক্ষর (নশ্বর) ভাবান্তর্গতরূপে ব্রহ্মকে অধিভূত এবং ক্ষরাভিমানী পুরুষে ব্রহ্মকে অধিদৈবত নামে জানিবে। যজ্ঞসমূহ মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, হে নরশ্রেষ্ঠ!

আমিই এই দেহেও অধিযজ্ঞরূপে আছি। অর্থাৎ একমাত্র আমিই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত আছি। অন্তকালেও যিনি আমাকে স্মরণ করতঃ কলেবর ত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করেন, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হয়েন—ইহাতে সংশয় নাই। অথবা সদা একই ভাবে তন্ময় থাকিয়া যে, যে ভাবে অন্তকালে শরীর ত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়! সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্ব্বদাই আমাকে ধ্যান (অনুচিন্তন) কর এবং যুদ্ধ কর (কারণ যুদ্ধে আমাকে চিন্তা করিতে করিতে শরীর ত্যাগ হইলেও আমাকে পাইবে)। আমাতে মন, বুদ্ধি অর্পিত হইলে নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে।

হে পার্থ! যোগাভ্যাস ফলে যুক্তচিত্ত দ্বারা বিষয়ান্তরে অনাকৃষ্টচিত্তে অনুধ্যান করিতে করিতে দিব্য (জ্যোতির্ম্ময়) পরমপুরুষই লব্ধ হইয়া থাকে। সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি, সর্ব্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, মন ও বুদ্ধির অগোচর (অচিন্ত্যরূপ), তমের (অপরাপ্রকৃতির) পরপার হইতে আদিত্যের ন্যায় প্রকাশময় পরম পুরুষকে যিনি সদা অনুধ্যান করেন—তিনি মৃত্যুকালে নিরুদ্ধচিত্তে ভক্তিযুক্ত হইয়া, ভ্রূযুগলের মধ্যে যোগবলে প্রাণকে সম্যকরূপে ধারণা করিয়া, সেই দিব্য পরম পুরুষকেই প্রাপ্ত হয়েন। বেদজ্ঞগণ যাঁহাকে অক্ষরব্রহ্ম বলেন, বিষয়ানসক্ত যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন এবং যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন—সেই

পরমপদ বিষয়ে তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার সকলকে সংযত করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরোধ পূর্ব্বক, তালুমূলে প্রাণকে স্থাপন করতঃ, আত্মযোগাবলম্বী হইয়া, ব্রহ্মমন্ত্র "ওঁ" রূপী একাক্ষর চিত্তমধ্যে জপ করিতে করিতে, আমাকে অনুধ্যান করিয়া যিনি দেহ ত্যাগান্তে প্রয়াণ করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন। হে পার্থ, বিষয়ান্তরে অনাকৃষ্ট চিত্তে যিনি আমাকে প্রতিনিয়ত সর্ব্বদা স্মরণ করেন—সেই নিত্যসমাহিত যোগীর পক্ষে আমি অতি সুলভ। আমাকে সমষ্টিরূপে প্রাপ্ত সিদ্ধমহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া দুঃখের আলয়স্বরূপ তথা অনিত্য পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়েন না। হে অর্জ্জুন! পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোকস্থিত সমস্ত লোক (ভূরাদি সপ্তস্বর্গ) হইতেই জীবগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আমার সামীপ্যলাভ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

সহস্র চতুর্যুগ ব্রহ্মার দিন এবং অপরার্দ্ধ সহস্র যুগব্যাপী কাল—তাঁহার রাত্রি। ইহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই অহোরাত্রি বেত্তা। ব্রহ্মার দিবা সমাগমে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ উদ্ভূত হয়। ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে সেই অব্যক্তসংজ্ঞক উপাদান কারণে লীন হয়। সেই প্রাণীভূত সকল জন্মিয়া রাত্রি সমাগমে অবশ হইয়া লীন হয় এবং দিবা সমাগমে প্রকটিত হয়। কিন্তু, সেই অব্যক্ত ভাব (মহতত্ত্ব) হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য সনাতন (নিত্য) অব্যক্ত (অক্ষর) যে ভাব

তাহা, সর্ব্বভূত নষ্ট হইলেও নষ্ট হয় না। সেই অবিনাশী অব্যক্ত ভাব হইতেছে—অক্ষর ব্রহ্ম। ইনিই পরমপদ বা জীবগণের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। যে পদকে পাইয়া পুনরাবৃত্তি হয় না—তাহাই, আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাম। অর্থাৎ অক্ষর-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাস্বরূপে অধিষ্ঠাত্রী আমি-ই। হে পার্থ! সেই অক্ষরান্তস্থিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ—যাঁহার মধ্যে ভূত স্বর্গাদি রচিত, তথা যাঁহা কর্ত্তৃক এই চরাচর বিশ্ব অন্তরে বাহিরে ব্যপ্ত রহিয়াছে—তিনি অনন্যাভক্তির দ্বারাই লভ্য।

এখন যেই কালে প্রয়াণকারী যোগীর অনাবৃত্তি (পুনর্জন্ম না হওয়া) বা আবৃত্ত (পুনঃর্জ্জন্ম) হইয়া থাকে, সেই কাল মাহাত্ম্য তোমাকে বলিতেছি। দীপ্ত সূর্য্যজ্যোতিবিশিষ্ট দিবাভাগে, শুক্লপক্ষে, উত্তরায়ণ ষণ্মাসকাল মধ্যে প্রয়াণ করতঃ ব্রহ্মবিদ্ জনগণ ব্রহ্মাই প্রাপ্ত হয়েন। কুয়াসাবৃত রাত্রি তথা কৃষ্ণপক্ষ দক্ষিণায়ন ষণ্মাসকাল মধ্যে প্রয়াণকারী যোগী চান্দ্রজ্যোতিকে (ব্যতিরেক বা বিকর্ষণী শক্তিপ্রবাহকে) প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসার ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসেন। জগতের শুক্ল, কৃষ্ণ এই দুটী গতি শাশ্বত (চিরন্তনী) বলিয়া মান্য। একটির দ্বারা অপুনরাগমন, অন্যটীর দ্বারা পুনরাগমন হইয়া থাকে। হে পার্থ—এই দুইটী চান্দ্র ও সৌর মার্গের জ্ঞান লাভ করিয়া কোনও যোগী মোহগ্রস্ত হয়েন না। সেই হেতুই, তুমিও সদা সর্ব্বদার জন্য যোগযুক্ত হও। দেখ, সকল বেদে—যজ্ঞে তপস্যাতে ও দানে যে পুণ্যফল নিরূপিত

আছে, যোগীজন এই মার্গদ্বয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া উক্ত পুণ্য সকলকেও অতিক্রম করতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম আদ্যস্থান লাভ করেন।

নবম অধ্যায় (রাজবিদ্যা—রাজগুহ্য যোগ)

শুক্ল কৃষ্ণরূপী শাশ্বত মার্গদ্বয়কে জানিয়া কিরূপে আদ্য পরমস্থান প্রাপ্তি করা যায়, তাহাই স্বরূপতঃ বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করিয়া, শ্রীভগবান বলিলেন—অসূয়াশূন্য তোমাকে গুপ্ততম অক্ষরতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ করিব, যে অপরোক্ষানুভূতিরূপ জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ করিবে, অর্থাৎ সংসার বন্ধনরূপী অশুভ ব্যাপার হইতে মুক্তি লাভ করিবে। এই অক্ষরবিজ্ঞান রাজবিদ্যা নামে খ্যাত—সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতম, গুহ্য হইতেও গুহ্যতম তত্ত্ব; অপরোক্ষানুভাব্য, অব্যয়তত্ত্বস্বরূপে সমস্ত ধর্ম্মের ফলদাতা, সুখসাধ্য (অর্থাৎ প্রতক্ষানুভূতির দ্বারা ধারণ যোগ্য) এবং সহজসাধ্য (যে হেতু আত্মানন্দ স্বরূপে লব্ধ হইয়া শ্রদ্ধা, ভক্তি স্বতই বিবৃদ্ধ হইয়া থাকে)। পূর্ব্বোক্ত শুক্লমার্গ (বা জ্ঞানমার্গ) এবং কৃষ্ণ মার্গ (কর্ম্মমার্গ) দ্বারা সংসার নিবৃত্ত হয় না। পরন্তু, শুক্ল-মার্গচারী যোগী অক্ষরবিজ্ঞান যোগে সর্ব্ব বিদ্যা বা জ্ঞানের আধার আনন্দময় অক্ষরপুরুষে যুক্ত হইয়াই ভক্তি লাভ

করেন। কর্ম্মনিষ্ঠা তথা জ্ঞাননিষ্ঠার পরপারে, প্রজ্ঞানানন্দময় অক্ষরপুরুষে যুক্ত হওয়ার পর্ব্বে ভগবদ্ভক্তি সুদুর্ল্লভ্য। এতদ্রূপে ভক্তিকেই রাজবিদ্যা বলা হইয়াছে। যেহেতু সমস্ত কর্ম্ম, জ্ঞানে ভুক্ত হইয়া, ঐ জ্ঞান আবার অক্ষরব্রহ্মে যুক্ত হইয়াই ভক্তি উৎপন্ন করে। এই অক্ষর পুরুষ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতম পদবী হেতু, তাঁহার বিজ্ঞানকে রাজবিদ্যা বলা হইল। সমগ্র বিশ্বে, জ্ঞানের অগোচর হইয়াও সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছেন, অতএবই তাঁহার তত্ত্ব রাজ্যগুহ্যতত্ত্ব। চিরস্বাতন্ত্র্য হেতু অপর কিছুরই সঙ্গে মিলিত না হওয়ায়—পবিত্রতম। প্রত্যক্ষ করিয়া জানা যায় বলিয়া প্রত্যক্ষাবগম্য। এই অক্ষর পদে অবস্থান হইলে অধর্ম্ম হইতে আর ভয় করিতে হইবে না, সর্ব্বদা ধর্ম্মেই যুক্ত হইয়া থাকা যায়—অতএব সুখে আচরণীয়।

হে পরন্তপ!—এই অক্ষর বিজ্ঞানযোগরূপী ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসার পথে বারংবার ফিরিয়া আসে। অব্যক্ত অক্ষর পুরুষরূপী আমা কর্ত্তৃক এই বিশ্বজগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে—সমস্ত ভূতই আমাতে স্থিত। আমি কিন্তু তাহাদিগেতে নই, অর্থাৎ অহঙ্কারাত্মক জগৎ প্রপঞ্চ আমাকে স্পর্শ করে না।—আবার ভূত-সকল আমাতেও স্থিত নহে—অর্থাৎ তাহারা অহঙ্কারের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া আমাকে জানিতেই পারে না। আমার অচিন্ত্য যোগমায়াশক্তিকে, দেখ।—আমার আত্মা ভূতধারক

তথা ভূতপালক হইয়াও—ভূতস্থ নহে অর্থাৎ ভূতভাবাপন্ন নহে। যদ্রূপ সর্ব্বত্রগামী মহান্ বায়ু সর্ব্বদাই আকাশে অবস্থিত থাকে তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে স্থিত, জানিও। হে কৌন্তেয়! সকল ভূতই কল্পক্ষয়ে আমার প্রকৃতিতেই লীন হয়; পুনর্ব্বার কল্পারম্ভে আমিই সে সকলকে সৃষ্টি করি। স্বীয় প্রকৃতিকে বশীকৃত করিয়া, প্রকৃতির বশে অবশ এই সমস্ত ভূতগণকে আমিই পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি। কিন্তু হে ধনঞ্জয়—সেই সমস্ত কর্ম্মে অনাসক্ত তথা উদাসীন-ভাবে অবস্থিত আমাকে, উক্ত সৃষ্টিকর্ম্ম সকল বদ্ধ করিতে পারে না। অধিষ্ঠাতা আমা কর্ত্তৃক ইক্ষিত (লক্ষিত) হইয়া, প্রকৃতি চরাচর সহিত জগৎকে প্রসব করে এবং সেই হেতুই জগৎ বারংবার উৎপন্ন হয়। নিষ্ফলকাম, বিফলকর্ম্মা, বিফল জ্ঞানী, বিক্ষিপ্তচিত্ত, মূঢ় ব্যক্তিগণ, মোহজনক রাক্ষসী তথা আসুরী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বভূতের মহেশ্বর স্বরূপ আমার পরমতত্ত্বকে না জানিয়া, মনুষ্য দেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে। অর্থাৎ, আমিই লীলা হেতু মনুষ্য আকারে সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছি, ইহা না জানিয়া পরস্পরের হিংসা দ্বেষাদিতে মত্ত থাকে—ইহাতে আমাকেই অবজ্ঞা করা হয়।

কিন্তু, হে পার্থ! মহাত্মাগণ দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করতঃ আমাকে ভূতবর্গের আদি তথা অব্যয়তত্ত্বরূপে জানিয়া, অনন্যচিত্তে ভজনা করেন। সতত আমার নাম কীর্ত্তন করতঃ শমদমাদি সাধনে দৃঢ় যত্নশীল হইয়া, নিত্যযোগ অবলম্বন

পূর্ব্বক আমার উপাসনা করেন এবং ভক্তিভরে আমাকে প্রণাম করেন। আবার অপর কেহ কেহ, জ্ঞান যজ্ঞদ্বারা ভজন করতঃ বিশ্বব্যাপী আমাকে সমষ্টি বা পৃথক পৃথক রূপে ভজনা করেন। আমিই শ্রৌতযজ্ঞ, স্মার্ত্তযজ্ঞ, আমিই পিতৃযজ্ঞ, আমিই মন্ত্র, আমিই আজ্য (ঘৃত), আমিই অগ্নি, তথা আমিই আহুতি। এই জগতের পিতামাতা, ধাতা, পিতামহ তথা একমাত্র পবিত্র জ্ঞেয় "ওঁ" কার এবং ঋক্ শ্যাম ও যজু বেদত্রয় আমিই। আমিই গতি, আমিই ভর্ত্তা, আমিই প্রভু, আমিই সাক্ষী, আমিই ভোগস্থান, আমিই শরণ (রক্ষক), আমিই সুহৃৎ, আমিই স্রষ্টা, আমিই সংহর্ত্তা, আমিই বিশ্বাধার, আমিই লয়স্থান তথা অবিনাশী বীজ (কারণ) স্বরূপ। হে অর্জ্জুন! আমিই উত্তাপ দান করি, আমিই ভূমি হইতে জল আকর্ষণ এবং বর্ষণ করি, আমিই অমৃত এবং মৃত্যুস্বরূপ, সৎ এবং অসৎ আমিই। ত্রিবেদী যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞদ্বারা আমাকেই পূজা করতঃ সোমরসপানে পূতপাপ হইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্তি কামনা করেন। তাঁহারা পূণ্যময় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া উত্তম দেবভোগ্য সকল ভোগ করেন। তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া, পূণ্যক্ষয়ে ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন। এইরূপে, কামভোগ পরবশ এই ব্যক্তিগণ বেদত্রয়োক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাতায়াত করিয়া থাকেন। অনন্যমনে ধ্যান করতঃ যে ব্যক্তিগণ আমার উপাসনা করিয়া থাকেন, নিত্যযুক্ত সেই ভক্তগণের যোগক্ষেম

(অভাবপূরণ তথা রক্ষাবিধান) আমিই করিয়া থাকি। আবার অপর যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য দেবতা উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমারই উপাসনা করেন—কিন্তু অবিধি-পূর্ব্বক। কেননা আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা তথা প্রভু। আমাকে তত্ত্বতঃ না জানাতেই তাঁহারা সংসারে পতিত হন। দেবপূজকগণ দেবগণকেই প্রাপ্ত হয়েন। তদ্রূপ পিতৃপূজক-গণ পিতৃগণকে, এবং ভূতোপাসকগণ ভূতগণকেই, প্রাপ্ত হন। আমার উপাসকগণও আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন। যিনি, আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জলাদি ভক্তিপূর্ব্বক দেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির উপহার গ্রহণ করিয়া থাকি।

হে কৌন্তেয়! যাহা কিছু কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর এবং যে তপস্যা কর—তাহা, আমাতেই অর্পণ করিও। এইরূপে কর্ম্ম করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, এবং বিযুক্ত হইয়া কর্ম্মসন্ন্যাস হেতু যোগযুক্ত আত্মা দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি সর্ব্বভূতেই সমানরূপে আছি। আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। তত্রাপি যাঁহারা আমাকে ভক্তিদ্বারা ভজনা করেন, তাঁহারাই আমাতে থাকেন এবং আমিও তাঁহাদিগের হৃদয়ে অবস্থান করি। অর্থাৎ ভক্তগণ প্রত্যক্ষ দেখেন যে, আমি তাঁহাদের মধ্যে আছি। যদি অত্যন্ত দুরাচারীও আমাকে অনন্যচিত্তে ভজনা করে, তাঁহাকেও সাধু বলিয়াই জানিবে; কারণ সে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন সেই

ব্যক্তি ভজনাদ্বারা শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় এবং নিত্যশান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার যে আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না। হে পার্থ! স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র তথা যাহারা পাপযোনি সম্ভূত, তাহারাও আমার আশ্রয় লইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। পবিত্র ব্রাহ্মণগণ তথা ভক্ত ও রাজর্ষিগণ সম্বন্ধে আবার কথাই বা কি? অনিত্য ও দুঃখের আলয়স্বরূপ এই জগতে আসিয়া, আমারই ভজনা কর। মদ্‌গতচিত্তে আমার ভক্ত হও, আমার পূজক হও, আমাকেই প্রণাম কর। আমাপরায়ণ হওয়তঃ এইরূপে আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া আমাকেই পাইবে।

দশম অধ্যায় (বিভূতি যোগ)

হে মহাবাহো! আরও আমার উৎকৃষ্ট বাক্য তুমি পুনরায় শ্রবণ কর। প্রীতিমান তোমাকে তোমার হিতার্থেই বলিতেছি। দেবগণ বা মহর্ষিগণ আমার উৎপত্তি জানেন না; কারণ, তাঁহাদিগেরও আমি আদি। যিনি সর্ব্বলোক মহেশ্বর আমাকে, অজ তথা অনাদি বলিয়া জানেন, মর্ত্ত্যলোক মধ্যে সেই মোহশূণ্য ব্যক্তিই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য,দম, শম, সুখ, দুঃখ, উৎপত্তি, নাশ, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অযশ ইত্যাদি প্রাণীগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাবসকল আমা হইতেই উৎপত্তি হয়। সপ্তমহর্ষি (ভৃগু, মরিচী, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য ও ক্রতু), চিত্তাধিষ্টাতা বাসুদেব, অহঙ্কারাধিষ্ঠাতৃ সংকর্ষণ, প্রজ্ঞার অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন, মনের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ (অর্থাৎ বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র এই চারিজন) তথা মনুগণ (সায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, বৈরত, চাক্ষুস, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেব-সাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি)—আমারই চিত্ত ও মন হইতে উদ্ভূত। এই জগতের লোকসকল, উহাদিগেরই সন্ততি। আমার এই যোগবিভূতি সমূহ যিনি স্বরূপত জানেন—তিনিই অবিচলিত চিত্তে যোগ ধারণার দ্বারা আমাতে যুক্ত হয়েন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমিই সকলের প্রকাশস্বরূপ অর্থাৎ আমিই বিশ্বমূল, আমা হইতেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়। ইহা জানিয়া জ্ঞানীগণ প্রেমাবিষ্টচিত্তে আমার ভজনা করেন। চিত্ত এবং প্রাণ আমাতে নিবিষ্ট করিয়া মদ্বিষয়ক জ্ঞান পরস্পরে আলোচনা করতঃ আমার গুণানুবাদ দ্বারা নিত্য সন্তোষ ও সুখ লাভ করেন। প্রেমাবিষ্টচিত্তে সতত ভক্তিযোগে যুক্ত আমার ভজনাকারীদিগের সেই বুদ্ধিযোগ আমিই প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্তি করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহবশতই আমি আত্মভাবস্থ হইয়া তাঁহাদিগের

অজ্ঞানতমকে উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ দ্বারা (প্রজ্ঞার বিকাশ দ্বারা) নাশ করি।

অর্জ্জুন বলিলেন,—আপনি পরমব্রহ্ম, পরমধাম, পরম পবিত্র। সকল ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ তথা অসিত, দেবল, ব্যাস আপনাকে নিত্যপুরুষ, জন্মরহিত, স্বয়ংপ্রকাশ আদিদেব তথা বিভু বলিয়া থাকেন এবং আপনি নিজেও তাহা বলিতেছেন। হে কেশব! এই সকলই যাহা তুমি বলিতেছ, চক্ষে দেখার ন্যায় সত্য বলিয়া মানিতেছি। হে ভগবন্, তোমার ব্যক্তিত্বকে দেব বা দানবগণ কেহই জানে না! হে ভূতভাবন ভূতেশ, দেবদেব জগৎপতে, পুরুষোত্তম! তুমিই নিজ আত্মার দ্বারা তোমার আত্মাকে জানিতে সক্ষম। তুমি যে সকল বিভূতি দ্বারা এই লোকসকল ব্যপিয়া রহিয়াছ সেই দিব্য (প্রকাশময়) আত্মবিভূতি সমূহ বিস্তৃতরূপে বলিতে যোগ্য হও। হে যোগিন্! আমি তোমাকে কি প্রকারে সর্ব্বদা ধারণা দ্বারা চিন্তা করিয়া জানিতে পারিব? হে ভগবন্! এবং কোন্ কোন্ পদার্থে আমাদ্বারা তুমি ধ্যানযোগ্য হইবে? হে জনার্দ্দন! পুনর্ব্বার বিস্তৃতরূপে আত্মার যোগ বিভূতি কীর্ত্তন কর—কারণ অমৃততত্ত্ব শ্রবণে আমার তৃপ্তি হয় নাই।

শ্রীভগবান বলিলেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি আত্মবিভূতি সকলের প্রধান প্রধান গুলিকেই বর্ণনা করিব, কারণ আমার বিভূতি সকলের বিস্তারের অন্ত নাই। হে

গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে স্থিত আত্মা—আমিই; সর্ব্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্তও আমি। আমি আদিত্যদিগের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কদিগের মধ্যে রবি, মরুৎগণের মধ্যে মরিচী, এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমিই চন্দ্রমা। বেদসকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়বর্গ মধ্যে মন, ভূতগণের মধ্যে চেতনা—আমিই। ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রেরক রুদ্রগণের মধ্যে আমিই শঙ্কর। যক্ষ ও রক্ষগণের মধ্যে কুবের তথা অষ্টপ্রকৃতির ধারক বসুগণের মধ্যে পাবক (অগ্নি) এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে মেরু পর্ব্বত আমিই। হে পার্থ! পুরোহিত-গণের মধ্যে প্রধান, বৃহস্পতি—আমাকেই জানিও। সেনাপতি-গণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় এবং জলাশয় সকলের মধ্যে সাগর আমিই। মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, শব্দ সকলের মধ্যে একাক্ষর ওঁকার, যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবর পদার্থের মধ্যে হিমালয়—আমিই। বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি এবং অশ্বগণের মধ্যে অমৃত হইতে উদ্ভূত উচ্চৈশ্রবা—আমিই, জানিও। গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত তথা মনুষ্য-গণের মধ্যে রাজা বলিয়া আমাকে জানিও। অস্ত্র সমূহের মধ্যে আমি বজ্র। ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু তথা প্রাণী-গণের উৎপত্তির হেতুভূত কন্দর্প, আমাকেই জানিও। সর্পগণের মধ্যে বাসুকি, নাগগণের মধ্যে অনন্ত এবং জলচরদিগের মধ্যে বরুণ—আমিই। পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা তথা নিয়ন্তৃ-

গণের মধ্যে যম—আমিই। দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, গননা বা গ্রাসকারীদিগের মধ্যে কাল—আমিই। পশুদিগের মধ্যে সিংহ এবং পক্ষীদিগের মধ্যে গরুড়—আমিই। বেগবানদিগের মধ্যে পবন আমি, শস্ত্রধারীদিগের কধ্যে রাম আমি, মৎস্যগণ মধ্যে মকর আমি ; স্রোতস্বতীগণ মধ্যে আমিই গঙ্গা। সৃষ্টবস্তু সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত আমিই। বিদ্যাসকলের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা এবং তার্কিকগণের বাদ নামক তর্কও—আমিই। অক্ষর সমূহের মধ্যে "অ" কার আমি, সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব। আমিই অক্ষয় কাল স্বরূপ এবং আমিই সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া কর্ম্ম ফলসকল দান করি অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা। সর্ব্বসংহারক মৃত্যুও আমি. আবার ভবিষ্যতের প্রাণীগণের উৎপত্তিও আমি। স্ত্রীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমারূপিণী আমাকেই জানিবে। সাম বেদোক্ত মন্ত্র সকলের মধ্যে আমিই বৃহৎসাম (ইহাতে ইন্দ্রকে সর্ব্বময় ব্রহ্মারূপে কল্পিত হইয়াছে) এবং ছন্দঃ সপ্ত মধ্যে, আমি গায়িত্রী। মাস সকলের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ)। ঋতু সকলের মধ্যে বসন্ত আমি। ছলনাকারীগণের দ্যূত (অক্ষ বা জুয়াখেলা) এবং তেজস্বীগণের তেজ আমিই। আমিই জয় ও অধ্যবসায়, তথা সাত্ত্বিকগণের সত্ত্ব আমিই। বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে বাসুদেব আমি, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয় আমি। মুনিদিগের মধ্যে ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য আমিই। দমনকারীগণের দণ্ড এবং জয়েচ্ছুগণের নীতি আমিই। গোপনীয় বস্তুর মধ্যে মৌন আমি এবং

জ্ঞানীগণের জ্ঞানও আমিই! হে অর্জ্জুন! আরও যাহা কিছু সর্ব্বভূতোৎপত্তির কারণীভূত স্বরূপ, তাহা আমিই। চরাচর জগতে আমা ছাড়া যাহা হইতে পারে, তাহা নাই, (অর্থাৎ আমাতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে)। হে পরন্তপ!—আমার দিব্য (আত্মাতে কল্পিত) বিভূতি সকলের অন্ত নাই। উপরোক্ত বর্ণনাতে তো আমার বিস্তারিত বিভূতির দিক দর্শনরূপে কথিত হইল মাত্র। যাহা যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য সমন্বিত বা শ্রী সম্পন্ন অথবা অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত, সে সকলকেই আমার শক্তি অংশসম্ভূত জানিবে। অথবা হে অর্জ্জুন! এতশত বিভূতি বিস্তার জানিয়া কোন্ ফলই বা সিদ্ধ হইবে? মোট কথায় জানিয়া রাখ যে, এই সমগ্র জগৎ আমার একাংশে মাত্র ধৃত রহিয়াছে—ওতপ্রোতভাবে আমি সকলেতেই অনুপ্রবিষ্ট আছি।

একাদশ অধ্যায় (বিশ্বরূপ দর্শন যোগ)

শ্রীভগবানের আত্মবিভূতি সকল নবম ও দশম অধ্যায়ে শ্রবণ করতঃ, অর্জ্জুন ভাবিতে লাগিলেন যে শ্রীভগবানের চিত্তমধ্যে এত বড় বিরাট বিশ্ব কিরূপে বিধৃত আছে, তথা তদবস্থে শ্রীভগবানের রূপই বা কি প্রকার হইবে? যদিও ইহা মনুষ্যবুদ্ধি দ্বারা ধারণাযোগ্য নহে, তবুও শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে

অসম্ভবও নহে—তাই জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—হে কৃষ্ণ ! আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থেই তোমাকর্ত্তৃক পরম গুহ্য অধ্যাত্ম-সংজ্ঞক যে বাক্য সকল উক্ত হইল তদ্বারা আমার এই মোহ বিদূরিত হইল। হে কমলদলনেত্র !—তোমার নিকট হইতে ভূতবর্গের উৎপত্তি তথা লয় বিস্তৃতরূপেই আমি শুনলাম এবং তোমার অব্যয় স্বরূপের মহাত্ম্যও শুনিলাম। হে পরমেশ্বর ! তুমি আত্মস্বরূপের যদ্রূপ বর্ণন করিলে তাহা ঐ রূপই বটে (অর্থাৎ আমি নিসংশয়িতরূপে বোধগম্য করিতে পারিতেছি)। হে পুরুষোত্তম !—আমি তোমার ঐ ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। হে প্রভো ! যদি তুমি মনে কর আমি দর্শনের যোগ্য তাহা হইলে, হে যোগেশ্বর ! তুমি আমাকে অব্যয় আত্মস্বরূপের দর্শন করাও। শ্রীভগবান বলিলেন,—হে পার্থ, আমার নানাবিধ অলৌকিক বর্ণ তথা আকৃতিবিশিষ্ট শতশত সহস্র সহস্র রূপসকল দেখ। হে ভারত ! আদিত্যগণকে, বসুগণকে, রুদ্রগণকে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে তথা মরুৎগণকে দেখ, এবং অনেকানেক অদৃষ্টপূর্ব্বক আশ্চর্য্যসমূহকেও দেখ। হে গুড়াকেশ ! এই আমার দেহে একত্র সংস্থিত সমগ্র চরাচরসহিত জগৎ এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, আজ দেখ। তোমার এই নিজ চক্ষু দ্বারা আমাকে দেখিতে সক্ষম হইবে না। তোমাকে আমি দিব্যচক্ষু দিতেছি। আমার ঈশ্বরীয় ভাবে বিশ্ব ধারণ, পোষণ, সংহননাদির কৌশলরূপ যোগ দর্শন কর।

সঞ্জয় বলিলেন—হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র ! মহাযোগেশ্বর হরি

এইরূপ বলিয়া, তদনন্তর পার্থকে পরম ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করাইলেন। অসংখ্য মুখ ও নয়ন, অসংখ্য অদ্ভূত দর্শন, অসংখ্য দিব্যাভরণ, অসংখ্য দিব্য উদ্যত অস্ত্রসমূহ, দিব্যমাল্য বস্ত্রধারী, দিব্যগন্ধ তথা অনুলেপ (চন্দনাদি), সমস্ত আশ্চর্য্য সমূহে শোভিত, সর্ব্বব্যাপী অনন্তদেবকে দর্শন করাইলেন। আকাশে যদি সহস্র সূর্য্যের প্রভা যুগপৎ উত্থিত হইত, তবে সেই মহাত্মার প্রভাব তুল্য হইতে পারিত। তখন অর্জ্জুন, সেই দেবদেবের দেহে নানাভাগে বিভক্ত, তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গস্বরূপ একত্রস্থিত, সমগ্র জগৎ দেখিয়াছিলেন। ঐরূপ দর্শনে ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিশিষ্ট তথা রোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক দ্বারা সেই দেবকে প্রণাম করতঃ বলিলেন—হে দেব! তোমার দেহে সমস্ত দেবগণকে তথা স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমূহকে, দিব্যঋষিগণকে, সমস্ত সর্পকুলকে, সৃষ্টিকর্ত্তা কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ!—অনেক বাহু, উদর ও মুখ নেত্র বিশিষ্ট, অনন্তরূপ তোমাকে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। তোমার অন্ত, মধ্য ও আদি লক্ষিত হইতেছে না। কিরীট গদা ও চক্রধারী, সর্ব্বত্র দিপ্তিশীল তেজপুঞ্জ স্বরূপ, দুর্নিরীক্ষ্য, অপ্রমেয় তোমাকে, চতুর্দ্দিকেই অগ্নি ও সূর্য্যের তেজপ্রভার ন্যায় দেখিতেছি। তুমিই অক্ষর পুরুষ, এই বিশ্বের আশ্রয়স্থলরূপে একমাত্র জ্ঞাতব্য তত্ত্ব তুমিই। অব্যয়স্বরূপে শাশ্বত ধর্ম্মের রক্ষক সনাতন পুরুষ, তুমিই। ইহাই তো আমার ধারণা। আদি অন্ত ও মধ্যহীন, অনন্ত শক্তি

সম্পন্ন, অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট, চন্দ্রসূর্য্যরূপ নেত্রদ্বয় যুক্ত, প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য মুখবিশিষ্ট, স্বীয় তেজ দ্বারা এই জগতের সন্তাপকারী তোমাকে দেখিতেছি। হে মহাত্মন্! —স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে এই যে অন্তরীক্ষ, একমাত্র তোমার দ্বারাই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। দিকসকলও ব্যাপিয়া রহিয়াছ। তোমার এই অদ্ভূত উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ত্রিলোক ব্যথিত হইতেছে! ঐ যে! দেবগণও তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন, কেহ কেহ ভীত হওয়তঃ কৃতাঞ্জলিপুটে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন। মহর্ষি তথা সিদ্ধপুরুষগণও স্বস্তিবাচন করতঃ অতি সুন্দর স্তুতিবাক্যে তোমার স্তব করিতেছেন। রুদ্র, বসুগণ এবং সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তথা মরুৎগণ, উষ্মপায়ী পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর এবং সিদ্ধগণ সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তোমাকে দেখিতেছেন! হে মহাবাহো! তোমার অসংখ্যবদন, বহুনেত্র বিশিষ্ট, বহু বাহু উরু ও চরণে শোভিত, বহুদন্তহেতু ভীষণ, মহৎ রূপ দেখিয়া লোক সকল ব্যথিত হইতেছে। তদ্রূপই আমিও ব্যথিত হইতেছি। হে বিষ্ণো! নভস্পর্শী তেজোময় নানাবর্ণবিশিষ্ট বিস্ফারিত মুখ তথা অতি উজ্জ্বল বিশাল নেত্র যুক্ত তোমাকে দেখিয়া, ব্যথিত চিত্ত আমি ধৈর্য্য ও শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। ভীষণ দন্ত সকল বিশিষ্ট প্রলয়াগ্নি তুল্য তোমার মুখ সকল দেখিয়া দিক সকল জানিতে পারিতেছি না। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও। নৃপতিগণের সহিত ঐ যে ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রেরাই তথা ভীষ্ম,

দ্রোণ এবং ঐ সুতপুত্র কর্ণ আমাদিগের প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণসহ দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া, তোমার ভীষণ দন্ত সমূহে শোভিত মুখসকলে প্রবেশ করিতেছে; কেহ কেহ চূর্ণিত মস্তকে, তোমার দন্ত সন্ধিতে সংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে। যেমন নদী সকলের বহু জলপ্রবাহ, সম্মুখে ধাবিত হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, তদ্রূপই এই জগতের বীরগণ চতুর্দ্দিকে প্রজ্জ্বলিত তোমার মুখগহ্বর সমূহেই প্রবেশ করিতেছে। যেমন পতঙ্গসকল অতিবেগে ধাবিত হইয়া মরণেরই জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তদ্রূপই লোকসকলও বেগে ধাবিত হইয়া নাশের জন্যই তোমার মুখসকলে প্রবেশ করিতেছে। জ্বলন্ত মুখ-সকল দ্বারা সমস্ত লোককে গ্রাস করতঃ সর্ব্বত্র চারিদিকেই লেহন করিতেছে। উগ্রমূর্ত্তি আপনি কে, আমাকে বলুন, আপনাকে নমস্কার করিতেছি। হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনি প্রসন্ন হউন। আদি পুরুষ আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করি, যেহেতু আপনার প্রবৃত্তি জানিতে পারিতেছি না। শ্রীভগবান বলিলেন—আমি প্রবৃদ্ধ কাল (মহাকাল)। লোক সকলকে সংহার করিতে এখানে প্রবৃত্ত। তুমি যুদ্ধ না করিয়া শুধু সাক্ষীস্বরূপে থাকিলেও দেখিতে পাইবে যে, বিপক্ষদলে যে সকল সৈন্য অবস্থিত আছে তাহারা কেহই থাকিবে না। অতএবই, তুমি উঠ, যশলাভ কর। শত্রুজয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। আমা কর্ত্তৃক ইহারা ইতি পূর্ব্বেই নিহত হইয়া আছে। হে সব্যসাচী (উভয়হস্তে ধনুর্ব্বান চালনাকারী)! তুমি নিমিত্তমাত্র

হও। দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ তথা কর্ণ এবং অন্যান্য যোদ্ধা-বীরগণ আমা কর্ত্তৃক হত হইয়াই আছে, তুমি কেবল নিহত (জয়) কর। আশঙ্কা করিও না—যুদ্ধে প্রতিপক্ষগণকে জয় করিবেই। অতএবই যুদ্ধ কর।

সঞ্জয় বলিলেন, কেশবের এই বচন শুনিয়া কম্পিত কলেবর অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করতঃ গদ গদ স্বরে কহিলেন—হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তণে জগৎ অতি হৃষ্ট তথা অনুরক্ত হয়, রাক্ষসগণ ভীত হইয়া দিগন্তে পলায়ন করে, সমস্ত সিদ্ধপুরুষগণও নমস্কার করেন—ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। হে মহাত্মন, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস! ব্রহ্মারও গুরু তথা আদিকর্ত্তা তোমাকে কেনই বা নমস্কার না করিবেন? সৎ এবং অসতের পরে যে অক্ষর তাহাই তুমি! হে অনন্ত রূপ! তুমিই আদি দেব পুরাণপুরুষ। তুমিই এই বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম আশ্রয়। তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয়, তুমিই পরমধাম; তোমার দ্বারাই বিশ্বসংসার ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তুমিই বায়ু, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক প্রজাপতি তথা ব্রহ্মারও জনক তুমি। তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনঃ পুনঃ নমস্কার, আবারও তোমাকে নমস্কার করিতেছি। অগ্রভাগ তথা পৃষ্ঠদেশ হইতে তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে সর্ব্ব! তোমাকে চতুর্দ্দিক হইতেই নমস্কার করিতেছি। হে অনন্তবীর্য্য অমিত বিক্রম! তুমি সর্ব্ব-বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ, সেই জন্যই তুমি সর্ব্বস্বরূপ। তোমার মহিমা তথা এই বিশ্বরূপ স্বরূপের জ্ঞান না থাকাতে আমার

দ্বারা অজ্ঞানতাবশতঃ সৌখ্যভাবে "তুমি" "হে কৃষ্ণ" "হে যাদব," "হে সখা" ইত্যাদিরূপ অবিনয়ে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে—হে অচ্যুত ! আমোদ ক্রীড়া, শয়ন, আসন, ভোজন কালে একাকী অথবা বন্ধুজন সমক্ষে পরিহাসচ্ছলে যেরূপ অবজ্ঞাত হইয়াছ—অপ্রমেয় তোমার কাছে তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে অপ্রতিমপ্রভাব !—তুমি এই চরাচর বিশ্বের পিতা, পূজ্যগুরু তথা গুরুরও গুরু, ত্রিজগতেও তোমার তুল্য কেহ নাই। তোমাপেক্ষা অধিক অন্য কোথায় থাকিবে ? হে দেব ! আমি সেই হেতুই শরীরকে দণ্ডবৎ অবনত করিয়া প্রণামপূর্ব্বক, বন্দনীয় ঈশ্বর যে তুমি, তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। পুত্রের পিতার ন্যায়, সখার সৌখ্যের ন্যায়, প্রিয়ার প্রিয়ের ন্যায়, তুমি অপরাধ সহন করিতে যোগ্য হও। হে দেব ! অদৃষ্টপূর্ব্ব তোমার এই রূপ দেখিয়া আমি হর্ষিত হইতেছি, পক্ষান্তরে ভয়ের দ্বারাও আমার মন ব্যথিত হইতেছে। অতএব, হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস !—আমাকে তোমার সেই রূপই দেখাও। আমি তোমাকে কিরীটধারী, গদাচক্রধারী সেই রূপেই দেখিতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহো ! বিশ্বমূর্ত্তে ! সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিস্বরূপেই আবার প্রকাশ হও। শ্রীভগবান বলিলেন,—হে অর্জ্জুন, আমার প্রসন্নতার দ্বারাই আত্মযোগবলে এই অনন্ত, আদ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ প্রদর্শিত হইল যে রূপ, তুমি ভিন্ন অপর কর্ত্তৃক পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। হে কুরুপ্রবীর ! না ত বেদজ্ঞান দ্বারা, না যজ্ঞ দ্বারা, না অধ্যয়ন দ্বারা, না

দান দ্বারা, না ক্রিয়ার দ্বারা, না ত' উগ্রতপ দ্বারাও এই বিশ্বরূপ স্বরূপকে মনুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃক আমি দৃষ্ট হইতে পারি! আমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া তোমার ভয় না হউক, ব্যাকুলতাও দূর হউক। অপগত ভয় হইয়া প্রসন্নচিত্তে পুনর্ব্বার, তুমি আমার এই পূর্ব্ব রূপ দর্শন কর।

সঞ্জয় বলিলেন—বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া নিজের সেই চতুর্ভূজ বিষ্ণুরূপ দেখাইলেন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার সৌম্যবপু (দ্বিভুজ) ধারণ করতঃ ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন—হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষ রূপ দর্শন করিয়া এইক্ষণে আমি প্রকৃতিস্থ হইয়া চিত্তবৃত্তি যুক্ত হইলাম। শ্রীভগবান বলিলেন—আমার বিশ্বরূপ দর্শন করিলে, ইহা অতি দুর্ল্লভ দর্শন। দেবগণও নিত্য প্রতি এইরূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। আমাকে তুমি যেরূপে দেখিলে এতদ্রূপ আমি—বেদ, তপস্যা, দান বা যজ্ঞদ্বারাও দৃষ্ট হইনা। হে পরন্তপ, হে অর্জ্জুন! কেবলমাত্র অনন্যাভক্তির দ্বারাই ঈদৃশ আমি স্বরূপতঃ জানিতে, দেখিতে এবং প্রবেশ করিতে যোগ্য হই। হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমার জন্যই কর্ম্ম করেন, আমারই আশ্রিত, আমারই ভজনা করেন, তথা সর্ব্বভূতে বৈরশূন্য—তিনিই আমাকে প্রাপ্তি করেন।

—o—

দ্বাদশ অধ্যায় (ভক্তি যোগ)

অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন—তোমার এই বর্ত্তমান রূপকে যে ভক্তগণ সতত যুক্ত হইয়া উপাসনা করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা অক্ষর অব্যক্ত (কারণ ও সূক্ষ্ম) রূপী তোমার উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যোগীশ্রেষ্ঠ কে? শ্রীভগবান বলিলেন যে—নিত্যযুক্ত যাঁহারা পরম শ্রদ্ধার দ্বারা চিত্ত আমাতে সম্যক প্রকারে আবেশিত করিয়া আমাকে উপাসনা করেন, তাঁহারাই যোগীশ্রেষ্ঠ বা যুক্ততম,—ইহাই আমার মত। পরন্তু, যাঁহারা কুটস্থ, অচল, ধ্রুব, সর্ব্বত্রগ (সর্ব্বব্যাপী) অচিন্ত্য,অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত স্বরূপের উপাসনা করেন, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি বিশিষ্ট, সর্ব্বভূত হিতে রত, সেই সকল যোগী-গণও ইন্দ্রিয় সকল সংযমের ফলে আমাকে পাইয়া থাকেন। তবে, অব্যয় নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত চিত্ত সেই সাধকগণের সিদ্ধি লাভে অধিকতর ক্লেশ হয়। কারণ দেহধারীগণ অতিকষ্টে নির্গুণ ব্রহ্ম বিষয়ক নিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। হে পার্থ। কিন্তু যাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতেই অর্পণ করিয়া অনন্য ভক্তিযোগে আমাকে ধ্যান করতঃ উপাসনা করেন, আমাতে সমর্পিত চিত্ত সেই ভক্তগণকে মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে আমি অবিলম্বেই উদ্ধার করিয়া থাকি। আমাতেই মন স্থাপন কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর; অতঃপর উর্দ্ধলোকে আমাতেই বাস করিবে, ইহাতে সংশয়নাই।

হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতেই চিত্ত স্থিরভাবে সমাহিত করিতে অসক্ত হও, তবে অভ্যাস যোগ দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর। যদি অভ্যাস করিতে অসমর্থ হও তবে, আমার কর্ম্মপরায়ণ হও। অর্থাৎ আমিই এই বিশ্বসংসাররূপে পরিণত হইয়াছি এবং আমারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে এই জীব-জগৎ কর্ম্ম করিতেছে জানিয়া তুমিও আমার কর্ম্ম করিয়া যাও। এইরূপে আমার জন্য কর্ম্ম করিয়াও (অর্থাৎ কর্ত্তব্য মাত্র সম্পন্ন করিয়াও) সিদ্ধি লাভ করিবে। আর যদি কর্ত্তব্য মাত্র বোধে আমার বিশ্বকর্ম্মের কর্ম্মী হওয়াও তোমার পক্ষে অসাধ্য হয়, তবে সংযতচিত্তে অবস্থান করতঃ সকল কর্ম্মের ফল ত্যাগ দাও। সংশয় করিও না! উক্ত তিন প্রকারের প্রণালী, এক হইতে অন্যে নিকৃষ্ট নহে। অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেয়, জ্ঞান হইতে ধ্যান বিশেষ, ধ্যন হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠতম, ত্যাগ হইতেই শান্তি লাভ হয়।

সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি দ্বেষরহিত, মৈত্রীভাব সম্পন্ন, দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিহীন, নিরহঙ্কার, দুঃখেসুখে সমচিত্ত, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, সংযতেন্দ্রিয়, দৃঢ় নিশ্চয়ী, আমাতে অর্পিত মন-বুদ্ধি ভক্তই আমার প্রিয়। যে ব্যক্তি হইতে কোনও লোক উদ্বিগ্ন হয়েন না এবং যিনি অন্য কাহা হইতেও উদ্বিগ্ন হয়েন না, যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত—তিনিই আমার প্রিয়। নিস্পৃহ, শৌচসম্পান্ন, পক্ষপাতরহিত, মনঃ-পীড়াশূন্য, সকাম অনুষ্ঠানে বিমুখ যে ভক্ত—তিনিই আমার

প্রিয়। যিনি হৃষ্ট হয়েন না, দ্বেষ করেন না, তথা শুভাশুভ পরিত্যাগী, ভক্তিমান—তিনিই আমার প্রিয়। শত্রু ও মিত্রে তথা মান ও অপমানে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, শীতোষ্ণ সুখ ও দুঃখে সম, সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত, নিন্দা ও স্তুতিতে সমত্ববুদ্ধি বিশিষ্ট, সংযতবাক্, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান বিহীন, স্থিরচিত্ত, ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত অমৃতস্বরূপ এই ধর্ম্ম, শ্রদ্ধান্বিত তথা মৎপরায়ণ হইয়া সেবন বা উপাসনা করেন—সেই ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

(ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ)

এতাবৎ শ্রীভগবান কৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে সমষ্টিস্বরূপ অক্ষর চৈতন্যব্রহ্ম রূপ প্রদর্শনের পরেও বলিতেছেন যে—জীবের সাধ্য ও লক্ষ্য উহা নহে, বরং প্রিয়দর্শন সৌম্য দ্বিভুজ মূর্ত্তিই উপাস্য হইয়া শ্রেষ্ঠতম যোগপদে আরূঢ় করাইয়া থাকে। পরন্তু, তাঁহার সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহস্বরূপ দ্বিভুজ রূপের তত্ত্বতঃ কোনও বিচার এতাবৎ করেন নাই। এইবার উপনিষদ তথা দর্শনশাস্ত্র বিচার অবলম্বন করিয়া ব্যষ্টির ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ তথা জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এবং সমষ্টীর প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব নির্ণয় করতঃ অব্যক্তা প্রকৃতি এবং 'অক্ষর'

পুরুষের বর্ণন করিতেছেন। এই অব্যক্তা প্রকৃতি গুণময়ী। এই অক্ষর পুরুষ গুণ সম্পর্কহীন হইয়াও গুণভোক্তা। কিন্তু শ্রীভগবান এই গুণ সাম্যেরও ঊর্দ্ধে থাকিয়া বিশ্বলীলার হেতুভূত আনন্দঘন স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাই তিনি নির্গুণ হইয়াও গুণের ধারক তথা পোষক।

শ্রীভগবান বলিলেন—হে কৌন্তেয়! এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয়। যিনি এই শরীরকে জানেন বেদজ্ঞগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভীষ্ট করেন। হে ভারত! সর্ব্ব-ক্ষেত্রেতে ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকেই জানিও। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই আমার সম্মত। সেই ক্ষেত্র যাহা এবং যদ্রূপ বিকারী (তথা যাহা হইতে যে তত্ত্ব যদ্রূপে উৎপন্ন) এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা এবং যেরূপ প্রভাব বিশিষ্ট, তাহা আমা হইতে সংক্ষেপে শুন। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত কারণদর্শী ঋষিগণ দ্বারা বিবিধ ছন্দে, বিবিধভাবে উক্ত ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব গীত হইয়াছে। পঞ্চস্থূলভূত সকল (আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী), অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় এবং এক মন, পঞ্চরূপরসাদি (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) বিষয় সকল, ইচ্ছা দ্বেষ, সুখদুঃখ, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সংহতি (একত্রীকরণ), চেতনা, ধৃতি, (ধারণ ক্ষমতা)—এইগুলি সবিকার ক্ষেত্ররূপে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। অমানিত্ব, অদাম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি (ক্ষমা) আর্জ্জব (সরলতা), আচার্য্যোপাসনা (গুরুসেবা),

শৌচ (পবিত্রতা সদাচার), স্থৈর্য্য (একনিষ্ঠাহেতু স্থিরতা), আত্মবিনিগ্রহ (আত্মসংযম), ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা, জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধিরূপ দুঃখ পর্য্যালোচনা, বিষয়ে অনাসক্তি, পুত্রদার গৃহেতে মমত্বের অভাব, ইষ্ট বা অনিষ্ট উদয়ে সমচিত্ততা, আমাতে লক্ষ্য স্থির করতঃ যোগ-যুক্ত থাকিয়া ঐকান্তিক ভক্তি, নির্জ্জন স্থানে বাস, অনেকের সংসর্গে বিরাগ, আত্মাতে অধিগত হইয়া তৎজ্ঞানে জ্ঞানী (আত্মজ্ঞানী) হওন, মোক্ষের উপায় দর্শন (অর্থাৎ আত্যন্তিক মুক্তি কি তথা কিরূপে সম্ভব—ইহা পর্য্যালোচনা দ্বারা স্থিরি-করণ)—এইগুলিকে জ্ঞান বলা হয়। যাহা ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান। যাহা জ্ঞাতব্য, যাহা জানিয়া অমৃত প্রাপ্ত হয়—তাহা বলিতেছি। সেই আদ্যান্তহীন আমার নির্ব্বিশেষ রূপ, ব্রহ্ম—সৎও নহেন, অসৎও নহেন।

শ্রীভগবান এইক্ষণে ব্রহ্মের লক্ষণা করিতেছেন। সেই ব্রহ্ম, সর্ব্বত্র হস্ত পদ বিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষু মস্তক ও মুখ বিশিষ্ট, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয় বিশিষ্ট (বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—শব্দস্পর্শ-রূপরসাদির স্থান যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী হইলেও কেবলমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয় বলায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে শব্দগুণের স্থান আকাশের বিনাশ নাই।)—সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গুণের প্রকাশক হইয়াও সমস্ত ইন্দ্রিয়বিহীন, নিঃসঙ্গ হইয়াও সকল বস্তুর আধার স্বরূপ। গুণ রহিত হইয়াও সর্ব্বগুণের

ভোক্তা। সেই ব্রহ্ম ভূতসমূহের বাহির তথা অন্তর, স্থাবর এবং জঙ্গম ও। সূক্ষ্মতা হেতু তাঁহাকে জানিতে পারা যায়, না। দূরস্থিত হইয়াও নিকটস্থ। সেই ব্রহ্ম অখণ্ড হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াই যেন খণ্ডাকারে স্থিত ভূতসকলের ধারক, পোষক, গ্রাসকারী, তথা সৃষ্টিকারী হইয়া থাকেন। তিনি জ্যোতিঃ সমূহেরও জ্যোতিঃ, তমের (অবিদ্যার) পরে স্থিত বলিয়া কথিত হয়েন। তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্যরূপে সকলের হৃদে অবস্থিত আছেন। উক্তরূপে "ক্ষেত্র", "জ্ঞান" এবং "জ্ঞেয়" সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। আমার ভক্ত এইগুলি জানিয়া আমার ভাব প্রাপ্তি করিবার যোগ্য হয়েন।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও। বিকারসমূহ তথা গুণসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন বলিয়া জানিবে। কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু স্বরূপা বলিয়া কথিতা হয়েন। সুখ তথা দুঃখ ভোগ বিষয়ে পুরুষই হেতু স্বরূপ। পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়াই প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। ঐ গুণ-সমূহের সংসর্গই পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ স্বরূপ হয়। প্রকৃতিস্থ পুরুষের অর্থাৎ ক্ষরপুরুষের বর্ণনা করতঃ শ্রীভগবান গুণাতীত পর পুরুষ বা অক্ষর চৈতন্য ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। এই দেহে পর (শ্রেষ্ঠ, অন্য) পুরুষ (অক্ষর ব্রহ্ম) সাক্ষী স্বরূপ, অনুমোদনকারী,

ভরণকর্ত্তা, ভোক্তা (সকলেই তাহাতে লীন হয় হেতু), মহেশ্বর তথা পরমাত্মা নামে অভিহিত হয়েন।

যিনি এই প্রকারে পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্ব গুণসহ জানেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও গুণভাগী হয়েন না। কেহ কেহ ধ্যান দ্বারা আত্মাতে আত্মাকে দেখেন, অপর কেহ সাংখ্য বা জ্ঞান যোগ দ্বারা, আবার অপর কেহ কেহ কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া থাকেন। অন্য ব্যক্তিগণ স্বীয় আত্মা স্বরূপ আত্মাকে নিজের মধ্যে না দেখিয়া বা না জানিয়া, অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া উপাসনা করেন। তাঁহারাও আত্মোপদেশ শ্রবণ নিরত হইয়া শ্রদ্ধাযোগে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। হে ভরতর্ষভ! যাহা কিছু স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হইতেই উৎপন্ন জানিও। সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, বিনাশপ্রাপ্ত বস্তু মধ্যেও, অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শী। সর্ব্বভূতে সমান তথা সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিয়াই, আত্মা দ্বারা আত্মাকে ঘাত সম্ভবে না হেতুই, পরম গতি প্রাপ্ত হন। প্রকৃতি দ্বারাই কর্ম্মসকল সর্ব্বপ্রকারে সম্পাদিত হয়। আত্মা অকর্ত্তা, এতদ্রূপ যিনি দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শী। যখন, ভূত সমূহের পৃথক পৃথক ভাব একই আত্মাতে অবস্থিত এবং সেই আত্মা হইতেই অভিব্যক্ত, এতদ্রূপ দর্শন করেন, তখনই ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। যদ্রূপ সর্ব্বত্র

অবস্থিত আকাশ সুক্ষ্মতা নিবন্ধন বস্তু মধ্যে থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ সর্ব্বত্র অবস্থিত থাকিয়াও আত্মা দেহে লিপ্ত হয়েন না। যদ্রূপ, একই রবি এই সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করেন, তদ্রূপই ক্ষেত্রী আত্মা সমগ্র ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র তথা ক্ষেত্রজ্ঞের এই পার্থক্য এবং ভূত প্রকৃতির মোক্ষ (অষ্টধা জড় প্রকৃতিতে চৈতন্যাংশ জীব যে আসক্ত বা মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেই বন্ধন হইতে মুক্তি সাধন উপায়) যিনি জানেন, তিনিই পরমপদ লাভ করেন।

[এখানে শ্রীভগবান, সুখ দুঃখ ভোগী ব্যষ্টির ক্ষরপুরুষ জীবের বর্ণনা করতঃ, সেই জীবের কর্ম্মক্ষেত্র বর্ণনান্তর সত্ত্বস্থ জীবের জ্ঞান লক্ষণা করিয়া, সেই জ্ঞান দ্বারা লভ্য ব্রহ্মের সৎ ভাবকে বর্ণন করিলেন। অতঃপর বলিতেছেন যে, তাঁহার ভক্তগণ এইগুলি জানিয়াই তদ্ভাবে ভাবিত হইতে পারিবে। সেই সৎব্রহ্ম, চিৎব্রহ্মরূপে এই শরীরেও সাক্ষী স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন। তিনিই ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর তথা পরমাত্মা। এই চিদাত্মাকেই ধ্যান, জ্ঞান এবং কর্ম্মযোগে প্রাপ্তি করিতে হইবে। আত্মদর্শন হইলে আর হিংসাদ্বেষাদি থাকিবে না—ফলে পরাগতি প্রাপ্তি হইবে। প্রকৃতি কাজ করিতেছেন—আমি আত্মস্বরূপে নির্লিপ্ত, ইহাই আত্মদর্শন। অতঃপর সেই পরমাত্মস্বরূপ সমষ্টিব্রহ্মের লক্ষণা করিলেন,—অর্থাৎ নির্বীজ চিত্তের নিরুদ্ধ ভাব দেখাইলেন।]

চতুর্দ্দশ অধ্যায় (গুণত্রয় বিভাগ যোগ)

ইতিপূর্ব্বে, গুণভোক্তৃ আত্মার বর্ণন করিয়া অপরা প্রকৃতিস্থ জীবের মুক্তির হেতুভূত আত্ম-দর্শন অবশ্য সাধ্য, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই আত্ম-দর্শনকে "অপরা সিদ্ধি" বলিয়া প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছেন। এখন গুণাতিক্রম করিয়া অর্থাৎ রজোগুণাতীত হইয়া সদা সত্ত্বস্থ থাকিয়া শ্রীভগবানের উপাসনায় ভক্তিযোগ ফলে গুণাতীত হওয়াকেই "পরাসিদ্ধি" বলিতেছেন। তাই শ্রীভগবান বলিলেন ঃ— জ্ঞান সকলের মধ্যে সর্ব্বোত্তম পরমজ্ঞান পুনরায় বলিতেছি, যাহা জানিয়া সকল মুনিগণই এই ক্ষেত্র হইতে পরাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই জ্ঞানাশ্রয় করিয়া আমার সমধর্ম্মী (একাত্ম) বা সহধর্ম্মী (অঙ্গা অঙ্গী হিসাবে আমারই কর্ম্মে রত) হইয়া সৃষ্টিতেও জন্মগ্রহণ করেন না বা প্রলয়েও ব্যথিত হন না। হে ভারত! মহৎব্রহ্ম (অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতির গুণত্রয়ের অভিব্যক্তির স্থূলরূপ প্রজ্ঞাভূমি বা বুদ্ধিতত্ত্ব) আমার গর্ভধান-স্থানরূপী যোনি; তাহাতেই আমি গর্ভ (বিশ্বজগতের বীজ) আধান করি। তাহা হইতেই সর্ব্বভূত সমূহের উৎপত্তি হয়। হে কৌন্তেয়! সকল (দেব, মনুষ্য, পশ্বাদি) যোনিতে যে সকল শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাদের মাতৃস্থানীয়া মহৎব্রহ্ম এবং আমিই বীজপ্রদ

পিতা। হে মহাবাহো! প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ, তম— এই গুণত্রয়, দেহমধ্যে অব্যয় আত্মাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

হে অনঘ (নিষ্পাপ)! সেই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্ম্মলত্ব হেতু সত্ত্বগুণ প্রকাশময় এবং নির্দ্দোষ, তথা সুখ ও জ্ঞান সঙ্গদ্বারা আত্মাকে বন্ধন করে। হে কৌন্তেয়! রজোগুণ রাগাত্মক (অর্থাৎ প্রবৃত্তি জনক), তৃষ্ণা ও সঙ্গের (আসক্তির) উৎপাদক। উহা কর্ম্ম সঙ্গ দ্বারা আত্মাকে বন্ধন করে। হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞানজাত এবং সর্ব্বদেহীর ভ্রান্তির কারক বলিয়া জানিও। উহা ভ্রম, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা আত্মাকে বন্ধন করে। হে ভারত! সত্ত্বগুণ সুখে (অর্থাৎ আনন্দস্বরূপে) অবস্থান করে, রজোগুণ কর্ম্মে, এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া ভ্রম ও অনবধানতায় অবস্থান করে হে ভারত! সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমকে অভিভূত করিয়া প্রকাশস্বরূপে থাকে; রজোগুণ সত্ত্ব ও তমকে অভিভূত করিয়া আসক্তির আকারে প্রবল হয়; এবং তমোগুণ সত্ত্ব ও রজঃকে অভিভূত করিয়া অজ্ঞান মোহ আকারে অবস্থান করে। যখন এই দেহে সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয়, তখনই সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়াছে বলিয়া জানিও। হে ভরতর্ষভ! লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ (উদ্যম), অশম (বিক্ষেপ) ও স্পৃহা—এই সকল রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলেই

হয়। হে কুরুনন্দন! অন্ধকার (অবিবেক), অনুদ্যম, কর্ত্তব্যবিস্মৃতি, মোহ ও বিষয়ে সদা অভিনিবেশ—এই সকলই তমের বৃদ্ধিতে উৎপন্ন হয়। যখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে জীবের মৃত্যু হয় তখন তত্ত্বজ্ঞানীদিগের বিশুদ্ধ উত্তম লোকসমূহ লাভ হইয়া থাকে। রজোগুণে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যমধ্যে জন্মিয়া থাকে। তদ্রূপ তমোগুণে মৃত ব্যক্তি পশ্বাদি মূঢ় যোনিতে জন্মিয়া থাকে। পুণ্যবানের কর্ম্ম সাত্ত্বিক, নির্ম্মল ফলযুক্ত বলা হয়। রজোগুণের ফল দুঃখ এবং তমগুণের ফল অজ্ঞান। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণী ব্যক্তি ঊর্দ্ধে গমন করিয়া থাকেন (অর্থাৎ দিব্যভাব প্রাপ্ত হয়েন); রজোগুণী মধ্যে (অর্থাৎ মনুষ্যলোকে) অবস্থান করেন; প্রমাদমোহাদিযুক্ত নিকৃষ্ট তমোগুণী অধলোকে (অর্থাৎ পশ্বাদি যোনিতে) গমন করেন। যখন দ্রষ্টা পুরুষাত্মা ত্রিগুণ ভিন্ন অন্য কর্ত্তাকে দেখেন না তথা গুণসমূহ হইতে অতীত পুরুষকেও জানেন, তখনই সেই জীব আমার ভাব (সচ্চিদানন্দ ভগবদ্ভাব) প্রাপ্ত হয়েন। দেহী জীব দেহোৎপত্তির কারণস্বরূপা এই তিনটি গুণকে অতিক্রম করিয়া জন্ম, জরা, মৃত্যু দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়তঃ, অমৃত লাভ করিয়া থাকেন।

অর্জ্জুন বলিলেনঃ—হে প্রভু! কি কি চিহ্নদ্বারা এই

গুণসমূহ অতিক্রান্ত হয়? তথা কি প্রকার আচারযুক্ত হইয়া বা কি প্রকারে এই তিনগুণকে অতিক্রম করে? শ্রীভগবান বলিলেন:—হে পাণ্ডব! প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ—এই তিনটি গুণের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যিনি দ্বেষ করেন না, তথা নিবৃত্ত হইলেও যিনি আকাঙ্খা করেন না, উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করতঃ যিনি গুণদ্বারা বিচলিত হয়েন না বরং গুণসমূহ এইরূপেই স্বকার্য্য করিতেছে জানিয়া স্থিরচিত্তে অবস্থান করেন, যিনি সুখে ও দুঃখে সমান আত্মস্থ, মৃত্তিকা প্রস্তর ও সুবর্ণে সমবুদ্ধি, প্রিয় ও অপ্রিয় যাহার সমান এবং ধীরতাযুক্ত যিনি নিন্দা ও প্রশংসাতে, মান ও অপমানে, মিত্র ও শত্রুতে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট—এতদ্রূপ সর্ব্বকর্ম্মের উদ্যমবিহীন যে পুরুষ, তিনিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হয়েন। যিনি আমাকে ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে সেবা করেন তিনিই এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করতঃ ব্রহ্মপদ লাভ করেন; কারণ আমিই অব্যয়, অমৃত, শাশ্বত (চিরন্তনী) ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা (অর্থাৎ ভূমা) তথা ঐকান্তিক সুখেরও আলয়-স্বরূপ।

পঞ্চদশ অধ্যায় (পুরুষোত্তম যোগ)

এতাবৎ জীবতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব তথা জ্ঞান জ্ঞেয় এবং প্রকৃতি পুরুষের বর্ণন করতঃ শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগে অভিমানী হইয়াই আত্মা বন্ধনপ্রাপ্ত হয়েন।

এই গুণসমূহ হইতে উর্দ্ধে গুণসাম্যাবস্থারূপ অব্যক্ত-প্রকৃতিতে যুক্ত থাকিয়াই জীব পরাগতি প্রাপ্ত হয়। গুণত্রয়ের বর্ণন হইতে ইহাই জ্ঞাত হইল যে, সত্ত্ব, রজঃ, তম—এই তিনটিই জীবের বন্ধনের কারণস্বরূপ। তন্মধ্যে রজঃ আসক্তির এবং তম মোহের হেতুভূত বলিয়া অবশ্য ত্যজ্য। পরন্তু প্রকাশময় সত্ত্বগুণ, জ্ঞান এবং সুখের হেতুভূত হওয়াতে, অবশ্যই গ্রাহ্য। এই সত্ত্বগুণে অবস্থান হইলেই গুণাতীত অক্ষরপুরুষে অভ্যা-বিচারী ভক্তি যোগ লাভ হইতে পারে। অন্যথায়, রজঃ ও তমগুণের সংশ্লিষ্ট অবস্থায় ভক্তিলাভ সম্ভাব্য নহে। কারণ প্রকাশময়ী অব্যক্তা প্রকৃতিই অক্ষর ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে অনাদি অনন্তকাল অবস্থান করিতেছেন।

এক্ষণে শ্রীভগবান সংসার বৃক্ষের বর্ণনা করিয়া সেই অব্যয় অশ্বত্থের মূল ছেদনের উপদেশ দিতেছেন, তথা অক্ষর আদ্য পুরুষকে আশ্রয় করতঃ অক্ষরাংশ জীবভূত পুরুষের অক্ষরব্রহ্মে স্থিতি দ্বারা পুরুষোত্তম শ্রীভগবানে ভক্তিযোগে কৃতকৃত্যতার কথা বলিতেছেন। অক্ষরব্রহ্ম অধ্যাত্ম-প্রকৃতিযোগে উর্দ্ধে থাকিয়া যাহার মূলস্বরূপ, অধোদিকে গুণ বিস্তৃতিরূপ যাহার শাখাসমূহ, সপ্তলোক (ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপ, সত্য) ও সপ্তছন্দ (গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতি, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী) সকল যাহার পত্ররূপে কল্পিত—সেই অশ্বত্থকে অব্যয় বলা হয়।

প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইতেই ইহার জন্ম এবং প্রকৃতি অনাদি হেতু এই বৃক্ষের বারংবার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই অশ্বত্থকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ। সেই বৃক্ষের শাখারূপী গুণসমূহ দ্বারা বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিষয়রূপী পল্লবসকল অধোদিকে ও ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। ইচ্ছা বা বাসনাত্মিকা সংকল্প, যাহা প্রবৃত্তির মূল, সেই মূলসকলও মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনী হইয়া নিম্ন বা অধোদিকে ক্রমানুযায়ী বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এই সংসারে পূর্ব্ববর্ণিত বৃক্ষের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। তদ্রূপে, ইহার আদি, অন্ত বা স্থিতিও লক্ষিত হয় না। এই সুদৃঢ়মূল অশ্বত্থকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসঙ্গ শস্ত্রদ্বারা ছেদন করতঃ "যেখানে যাইয়া জীবগণ পুনরায় ফিরিয়া আসে না এবং যাহা হইতে গুণময়ী প্রকৃতির গুণসমূহ প্রবৃত্ত হইয়া বিস্তৃত রহিয়াছে, আমি সেই আদ্যপুরুষের শরণাপন্ন হইতেছি" সংকল্প দ্বারা সেই অক্ষর চৈতন্যস্বরূপ আদিপুরুষের অন্বেষণ করিতে হইবে। মান ও মোহ ত্যাগ করতঃ আসক্তিদোষ জয় করিয়া, সদা আত্মাধিগত চিত্তে কামনা হইতে নিবৃত্ত, সুখদুঃখসংজ্ঞক দ্বন্দ্ববিমুক্ত, বিবেকী সাধুগণই সেই অব্যয় পদে আরূঢ় হয়েন। যাহা প্রাপ্ত হইয়া সাধক প্রতিনিবৃত্ত হয়েন না সেই চিন্ময় অক্ষরকে সূর্য্য প্রকাশিত করেন না, চন্দ্রও না, অগ্নিও না, উহাই আমার পরমধাম্।

আমারই অংশ সনাতন জীবস্বরূপে প্রকৃতিতে অবস্থিত

হইয়া মন সহিত ছয়টি ইন্দ্রিয়কে জীবলোকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। দেহাদির অধিপতি ঈশ্বর (জীব) যে শরীর ত্যাগ করেন বা যেটি গ্রহণ করেন, —বায়ু যেমন আধার হইতে গন্ধ বহন করিয়া চলে তদ্রূপ—এই ইন্দ্রিয় ছয়টিকে গ্রহণ করতঃ লিঙ্গ শরীররূপে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। এই জীব—কর্ণ, চক্ষু, ত্বচা, জিহ্বা, ঘ্রাণ ও মনকে আশ্রয় করতঃ বিষয় সকল ভোগ করিয়া থাকেন। সত্ত্বাদিগুণ সংযুক্ত দেহে স্থিত, বিষয়ভোগে নিরত অথবা দেহান্তরে গমনশীল এই জীবকে, মূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না; জ্ঞাননেত্র বিশিষ্ট বিবেকীগণ দেখিতে পান। যত্নশীল যোগীগণ স্বীয়দেহে অবস্থিত এই আত্মাকে দেখিয়া থাকেন। যত্ন করিলেও অজিতেন্দ্রিয়, অবিবেকীগণ ইহাকে দেখিতে পায় না। সূর্য্যে স্থিত যে তেজ সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করেন এবং চন্দ্রমাতেও যে তেজ, উহা আমারই তেজ জানিও। আমিই পৃথিবীতে আবিষ্ট হইয়া তেজবলে ভূতগণকে ধারণ করিতেছি, তথা রসাত্মক সোম হইয়া ওষধিসকলকে পুষ্ট করিতেছি। আমিই বৈশ্বানর বা জঠরাগ্নিরূপে প্রাণীগণের দেহে অবস্থান করতঃ প্রাণ ও অপান বায়ুসহ মিলিত হইয়া চারি প্রকারের (চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়) অন্ন পরিপাক করি। আমিই সকলের হৃদে অধিষ্ঠিত আছি। আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং উহাদের অভাব। আমিই সকল বেদজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাতব্য, বেদান্তার্থ প্রকাশক, এবং বেদবিৎও আমিই।

জগতে ক্ষর তথা অক্ষর—এই দুইটি পুরুষই আছেন। সকল ভূতবর্গই ক্ষরনামে প্রসিদ্ধ। কূটস্থ (পর্ব্বতের ন্যায় অচল) তথা অবিকারী পুরুষকেই অক্ষর বলা হয়। পরন্তু, এই দুই পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠতম অন্য এক পুরুষ আছেন—তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয়, যিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া অব্যয়, ঈশ্বররূপে পালন করিতেছেন। যেহেতু আমি ক্ষরাতীত অক্ষর হইতেও উত্তম, সেই হেতুই লোকে বেদে—পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত আছি। হে ভারত! যিনি এই প্রকারে মোহশূন্য হওয়তঃ পুরুষোত্তমকে জানেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ—তথা সর্ব্বোতভাবে আমাকে ভজনা করেন। হে নিষ্পাপ ভারত! এই পুরুষোত্তম যোগতত্ত্ব নামক গুহ্যতম শাস্ত্র আমা কর্ত্তৃক বর্ণিত হইল। ইহা জানিয়া জ্ঞানী হওয়তঃ কৃতকৃত্য হইয়া থাকে।

ষোড়শ অধ্যায়

(দৈবাসুর সম্পদ্ বিভাগ যোগ)

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পুরুষোত্তম শ্রীভগবান প্রেম ভক্তিদ্বারা লভ্য। কিন্তু দৈবী (অধ্যাত্ম) সম্পদ বিশিষ্টেরই ঐ ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। অন্যথায়, আসুরী সম্পদ বিশিষ্টের উহা লভ্য নহে। তাই শ্রীভগবান দৈবী তথা আসুরী সম্পদ্

সমূহের লক্ষণা তথা ফল বর্ণন করিতেছেন। শ্রীভগবান বলিলেন—ভয়রাহিত্য, চিত্তশুদ্ধি,. অধ্যাত্মভাবে আত্মজ্ঞানে অবস্থিতি, দান, ইন্দ্রিয়দমন, যজ্ঞ বা ভগবৎকর্ম্ম, অধ্যাত্মশাস্ত্র বা ভক্তিশাস্ত্র পাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জ্জন, বা উদারতা, জীবে দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, হ্রী বা কুকর্ম্মে লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধারণক্ষমতা, শৌচ, অদ্রোহ বা অবিরোধিতা, অনভিমানিতা, ইত্যাদি,—হে ভারত! দৈবী সম্পদ অভিমুখে জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে। হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞান—এই সকল আসুরী সম্পদ অভিমুখে জাত ব্যক্তির হয়: হে পাণ্ডব! দুঃখ করিও না, তুমি দৈবী সম্পদ অভিমুখে জন্মিয়াছ।

হে পার্থ! এই জগতে দৈব এবং আসুর—দুইটি ভূতসর্গ বা ভূতসৃষ্টি আছে। দৈব—বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে; আসুর প্রকৃতির কথা আমার নিকট শ্রবণ কর। আসুর প্রাকৃতির লোকেরা,—কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তথা কোন্ বিষয়েই বা নিবৃত্ত থাকিতে হইবে,—তাহা জানে না। তাহাদিগের মধ্যে শৌচ বা আচার (অর্থাৎ সদাচার) এবং সত্যনিষ্ঠা বিদ্যমান নাই। তাহারা জগতকে অসত্য তথা অপ্রতিষ্ঠ (অর্থাৎ জগতের মূলে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব নাই হেতুই কোনও নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নাই) ঈশ্বরবিহীন, স্ত্রী পুরুষ সংযোগেই জগতের উদ্ভব হইয়াছে মাত্র, ইহার

অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা হেতু নাই—কেবল কামভোগ জন্যই ইহার উৎপত্তি, এইরূপ বলিয়া থাকে। এই প্রকার দৃষ্টি বা বুদ্ধি আরোপ করতঃ বিকৃতবুদ্ধি, ক্ষুদ্রমতি, ক্রূরকর্ম্মা, অহিত-কারিগণ জগতের ক্ষয়ের জন্যই জন্মিয়া থাকে। দম্ভ, মান, মদে মত্ত অশুচিব্রতীগণ দুষ্পূরনীয় বাসনার বশে মোহবশতঃ শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত অপরিমিত বিষয়চিন্তা অবলম্বন করিয়া কামভোগে আসক্ত হওয়তঃ—ইহাই যাহা কিছু জীবনের সার—নিশ্চয়জ্ঞানে শত শত আশার রজ্জুতে বদ্ধ থাকিয়া কামভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণ অসৎপথে অর্থসঞ্চয় ইচ্ছা করিয়া থাকে। অদ্য আমাকর্ত্তৃক ইহা লব্ধ হইল, এই অভিলষিত বস্তু পরে পাইব, ইহা আছে—পুনর্ব্বার আমার এই ধনও হইবে, এই শত্রু আমাকর্ত্তৃক হত হইয়াছে অন্যান্য শত্রুদিগকেও হনন করিব, আমি প্রভু আমি ভোগাধিকারী, আমি বলবান, আমি সুখী আমি ধনবান, তথা কুলীন—আমার তুল্য আর অপর কে আছে, আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, আমোদ করিব—এইরূপে অনেক প্রকারের কল্পনায় বিক্ষিপ্তচিত্ত অজ্ঞানে বিমূঢ়, মোহজালে জড়িত, কামভোগে আসক্ত ব্যক্তিগণ অশুচি নরকে পতিত হয়। আত্মশ্লাঘাবিশিষ্ট, অনম্র তথা ধনমানে অহঙ্কৃত সেই ব্যক্তিগণ দম্ভসহকারে নামমাত্র যজ্ঞদ্বারা অবিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করে। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম এবং ক্রোধের আশ্রয় লইয়া নিজের এবং অন্যের দেহস্থিত

আত্মারূপী আমাকে দ্বেষ করতঃ অসুয়াকারী হয় অর্থাৎ আমার ভজনগুণের প্রতি দোষারোপ করে। আমি দ্বেষপরবশ ক্রুরমতি সেই নরাধমদিগকে সংসারক্ষেত্রে পাপযোনিতে বারংবার নিক্ষেপ করি। হে কৌন্তেয়। জন্মে জন্মে আসুরী-যোনি প্রাপ্ত মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া আরও অধোগতি লাভ করে।

কাম, ক্রোধ তথা লোভ—এই তিনটিই নরকের দ্বারস্বরূপ আত্মার নাশক ; এই তিটিকেই ত্যাগ করিবে। হে কৌন্তেয়! নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিনটি হইতে মুক্ত হইয়া, মানুষ স্বীয় কল্যান সাধন করতঃ পরম গতি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি শাস্ত্র-বিধি ত্যাগ করিয়া কামভোগ জন্য যথেচ্ছাচারী হওয়তঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি বা সুখ কিছুই লাভ করিতে পারে না, পরাগতিও প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং কত্তব্য অকর্ত্তব্য নিরূপণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ স্বরূপ—এই জগতে শাস্ত্র ব্যবস্থা জানিয়া কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও।

সপ্তদশ অধ্যায় (শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ)

শ্রীভগবান শাস্ত্রবিধির আশ্রয় লওয়ার কথা বলিলে পর অর্জ্জুনের শঙ্কা হইল যে—

শাস্ত্রজ্ঞান লাভ সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই জিজ্ঞাসা

করিলেন—হে কৃষ্ণ! যাঁহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া যজ্ঞাদি করেন, তাঁহাদিগের নিষ্ঠা কিরূপ—সাত্ত্বিকী, রাজসী বা তামসী? শ্রীভগবান বলিলেন—দেহীদিগের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই তিন প্রকারের শ্রদ্ধা আছে, উহা স্বভাবজাত (পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কাররূপে বর্ত্তমান)। তাহা বিস্তারিত বলিতেছি শ্রবণ কর। হে ভারত! সকলেরই চিত্তসত্ত্বা অনুযায়ী শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। এই জীব পুরুষ শ্রদ্ধাময়। যে যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত সে সেইরূপই (অর্থাৎ তাহার চেষ্টা তদ্রূপই) হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের অর্চ্চনা করেন। রজোগুণী ব্যক্তিগণ যক্ষরক্ষদিগের, তথা অন্য তামসিক ব্যক্তিগণ প্রেত ও ভূতগণের অর্চ্চনা করে। দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত কামরাগবলশালী অবিবেকী ব্যক্তিগণ, দেহস্থিত পঞ্চভূত সমূহকে এবং অন্তকরণস্থিত আমাকেও ক্লিষ্ট করিয়া, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ভয়ঙ্কর উগ্রতপস্যা করে। তাহাদিগকে আসুরবুদ্ধি বিশিষ্ট জানিও।

সকল প্রাণীরই ত্রিবিধ প্রকারের আহার প্রিয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ যজ্ঞ, তপস্যা, দানও। উহাদের ভেদবর্ণন শ্রবণ কর আয়ু, বিন্দু (শুক্রধাতু), বল (বীর্য্য) আরোগ্য, চিত্ত প্রসাদ ও প্রীতি বৃদ্ধিকর, সরস বা মধুর, স্নেহময়, সারবান, হৃদয়ানন্দকর আহার্য্যসকল সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। অতিকটু, অম্ল, লবনাক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও প্রদাহকারী, দুঃখ শোক ও রোগপ্রদ আহার্য্য সকল রজোগুণীদিগের প্রিয়। শৈত্যাবস্থাপ্রাপ্ত, নির্গতরস

দুর্গন্ধযুক্ত বাসি তথা উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র যে ভোজন আহা তমো-গুণীদিগের প্রিয়। ফলাকাঙ্খাবিহীন ব্যক্তিগণ কর্তৃক "যজ্ঞ করিতে হয়" এইমাত্র জ্ঞানে, সমাহিত চিত্তে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়—তাহাই সাত্ত্বিক। কিন্তু ফলকামনা করিয়া বা দম্ভসহকারে (অর্থাৎ ধর্ম্মধ্বজিতা দেখাই-বার নিমিত্ত) যাহা অনুষ্ঠিত হয়, হে ভরত শ্রেষ্ঠ! সেই যজ্ঞকে রাজসিক জানিও। শাস্ত্রবিধিশূন্য, অন্নদানবিহীন, মন্ত্রবিহীন, দক্ষিণাবর্জ্জিত, শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞকে তামস বলা হয়। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, ও বিদ্বান ব্যাক্তির পূজা শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা ইত্যাদিকে শারীর তপস্যা বলে। যাহা অপরের মনঃপীড়ার কারণ হয় না, সত্য তথা প্রিয় এবং হিতজনক বাক্য এবং শাস্ত্রাভ্যাসকে বাঙ্ময় তপ বলে। চিত্তের প্রসন্নতা, অক্রুরতা, মৌনভাব, চিত্তসংযম, অসৎ ভাবনার উদয় না হওয়া—এই সকলকে মানসতপ বলে। ফলাকাঙ্খা বর্জ্জিত একাগ্রচিত্ত, ঈশ্বরপরায়ণ নরগণ কর্ত্তৃক পরম শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের (শারিরীক, বাচিক, মানসিক) তপস্যাকে সাত্ত্বিক বলা হয়। সৎকার মান বা পূজালাভের জন্য এবং দম্ভসহকারে যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, এই লোকে অনিত্য অনিশ্চিত সেই তপস্যাকে রাজস বলা হয়। দেহেন্দ্রিয়ান্তঃ-করণের পীড়াদ্বারা অথবা পরের বিনাশার্থে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে তামস বলে। "দেওয়া কর্ত্তব্য" এইমাত্র বুদ্ধিতে অনুপকারীকে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় যে দান দেওয়া হয়,

সেই দান সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়। পরন্তু, যাহা প্রত্যুপকারের আশায় অথবা স্বর্গাদি কামনায় চিত্তক্লেশ সহকারে দেওয়া হয়, সেই দান রাজস দান বলিয়া কথিত হয়। অনুপযুক্ত দেশে কালে এবং অপাত্রে যে দান করা হয়, অসাধুভাবে অবজ্ঞাভরে কৃত সেই দানকে তামস দান বলা হয়।

"ওঁ""তৎ""সৎ"—এই তিন প্রকারে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ জানিবে। এই নির্দ্দেশত্রয়ের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ, বেদ সকল এবং যজ্ঞসকল পূর্ব্বকালে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সেই হেতু "ওঁ" এই উচ্চারণ করিয়া (অর্থাৎ অক্ষরব্রহ্মে সমাহিত হইয়া) ব্রহ্মবাদিগণের শাস্ত্রীয় যজ্ঞদান তপক্রিয়া সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। "তৎ" উচ্চারণ করতঃ (অর্থাৎ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করতঃ) মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক ফল কামনাশূন্য চিত্তে বিবিধ যজ্ঞদান এবং তপক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। "সৎ" অর্থে অবিনাশী ব্রহ্মসত্ত্বা। সেই ব্রহ্ম দ্বারাই জগৎ ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। অতএব "যাহা কিছু সকলই ব্রহ্মময়"—এই "সৎ" ভাবে ভাবিত আত্মার সকল কর্ম্মই সৎকর্ম্ম হইয়া থাকে। হে পার্থ! বিবাহাদি মঙ্গল কর্ম্মেও "সৎ" শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে। (অর্থাৎ ফলাফল ঈশ্বরেই অর্পিত হইয়া থাকে)। যজ্ঞে তপস্যায় দানে স্থিতি অর্থাৎ নিষ্ঠা বা তৎপর হইয়া থাকাকেও "সৎ" বলা হয়। আবার এই সকলের জন্য যে সকল কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাও "সৎ" বলিয়া কথিত হয়। হে পার্থ! অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক কৃত হোম, দান, অনুষ্ঠিত তপস্যা এবং যাহা কিছু

আচরিত হয়, সে সকলই অসৎ। তাহা ইহলোকে বা পর-লোকে ফল দেয় না।

অষ্টাদশ অধ্যায় (মোক্ষ যোগ)

এবার অর্জ্জুন ভাবিতেছেন যে,—ব্রহ্মকে জানিয়া সদ্ভাবে তথা সাধুভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে; তবে ত', সন্ন্যাসই সিদ্ধ হইল। ইতিপূর্ব্বে শ্রীভগবান সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়কেই নিঃশ্রেয়স্কর বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে কর্ম্মযোগা-শ্রয়ীকেই বিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ ইহাও বলিয়াছেন যে কর্ম্মযোগাশ্রয় ব্যতীত শুধু সন্ন্যাস অবলম্বন দুঃখেরই কারণ হয়। যে কর্ম্ম নিজের সুখ বা দুঃখকে গ্রাহ্য না করিয়া ফলাকাঙ্খা বর্জ্জন পূর্ব্বক শুধু কর্ত্তব্যানুরোধেই আচরিত হইবে—সেই কর্ম্ম যতটুকু এবং অল্প তথা সহজসাধ্য হয় তাহাই কর্ত্তব্য; অথবা অনভিপ্রেত হইলে ত্যাগ করিলেই বা ক্ষতির সম্ভবনা কি? কর্ম্মসন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়েই তো ত্যাগমূলক। এই আত্মীয় স্বজনগণ বধে ত' আমার কিঞ্চিৎমাত্রও রুচি নাই। কর্ত্তব্যানুরোধেই যদি আমাকে এই যুদ্ধকর্ম্ম করিতে হয়, তবে সেই কর্ত্তব্যের বিচারই প্রথম হওয়া উচিত। শ্রীভগবান বলিতেছেন যে সমস্ত কর্ত্তব্যই ফলাকাঙ্খাহীন হইয়া সদর্থে আচরিত হইতে

হইবে। জীবের ভোগবাসনা আত্মার অধোগতির নিমিত্তের স্বরূপ। আমি যুদ্ধজয়ের বাসনা ত্যাগ দিয়া যুদ্ধে বিরত থাকিতে ইচ্ছা করি। এই ত্যাগ কি সন্ন্যাসের ত্যাগ হইতে বিভিন্ন? এতদ্রূপ চিন্তা করিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীভগবান বলিলেন—পণ্ডিতগণ কাম্যকর্ম্মফলের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলিয়া জানেন। বিচক্ষণ তত্ত্বদর্শীগণ সর্ব্ববিধ কর্ম্মেরই ফলত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণের কেহ কেহ বলেন যে, কর্ম্ম দোষযুক্ত, এই হেতু অবশ্যই ত্যাজ্য। অপর কেহ কেহ বলেন যে—যজ্ঞ, দান ও তপঃ কর্ম্ম ত্যাজ্য হইতে পারে না। হে ভরতসত্তম! সেই ত্যাগ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! ত্যাগও তিনপ্রকারের কথিত হইয়াছে। যজ্ঞ, দান তথা তপঃ কর্ম্ম ত্যাজ্য ত' নহেই বরং অবশ্য কর্ত্তব্য; যেহেতু যজ্ঞ, দান ও তপঃ কর্ম্ম ধীমান ব্যক্তিগণের দেহের তথা চিত্তের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। হে পার্থ! যজ্ঞ, দান ও তপঃ কর্ম্মগুলিও সঙ্গ তথা ফলসমূহ (অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ এবং ফল কামনা) ত্যাগ করিয়া আচরিত হওয়া উচিত—ইহাই আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। তুমি মনে করিতেছ যে এতশত যজ্ঞ, দান ও তপঃ কর্ম্ম করিয়াই বা কি হইবে—যদি কর্ত্তৃত্ব এবং ফলসঙ্গই না থাকিল? বরঞ্চ সর্ব্বত্যাগী হইয়া সংযতচিত্তে

মৌনাবলম্বী হইয়া কেন না থাকিব? আমি ত' তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি কদাচিৎ কেহ ক্ষণকালও অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মশূন্যাবস্থায় থাকিতে পারে না। প্রকৃতজাত গুণসমূহের দ্বারা প্রেরিত হওয়তঃ সকলেই অবশের মত কর্ম্ম করে। কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া যে মনে মনে বিষয় চিন্তা করে, সেই বিমূঢ় ব্যক্তি মিথ্যাচারী বলিয়া কথিত হয়; কারণ ঈদৃশ আচার দ্বারা সে ব্যক্তি সংযতাত্মা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সকলকে মনদ্বারা সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই অসক্ত ব্যক্তিকেই বিশিষ্ট বলা যাইতে পারে; কারণ, এই শেষোক্ত ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মসঙ্গী নহেন। এ ছাড়া তুমি যদি কর্ত্তব্যে বিমুখ হওয়তঃ অকর্ম্ম স্বরূপে থাক', শরীরযাত্রা অর্থাৎ আহার্য্য বস্ত্রাদিই বা কেমন করিয়া লভ্য হইবে? এই সকল পূর্ব্বোক্ত উপদেশ তোমার স্মরণপথে অবশ্যই আছে। নিয়ত বা স্বধর্ম্মানুরোধে অবশ্য কর্ত্তব্য, কর্ম্মের সন্ন্যাস (ত্যাগ) হইতেই পারে না, যেহেতু অন্নবস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য মনের আগ্রহ ত' ত্যক্ত হইতেই পারে না। মোহবশে এই অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিত্যাগকে তামস বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়াছে। উপার্জ্জন করিয়া সংগ্রহ করিতে কষ্টকর ব্যাপার বোধে, কায়ক্লেশের ভয়ে যে ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ করে সে, রাজসত্যাগ দ্বারা ত্যাগফল লাভ করে না (অর্থাৎ তাহার মনোদ্বিগ্নতা দূর হয় না)। হে অর্জ্জুন! কর্ত্তব্যজ্ঞানে যে নিয়তকর্ম্ম

করা হয়, কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ এবং ফলাকাঙ্খা বর্জ্জন করিলেই সেই ত্যাগ সত্ত্বিক বলিয়া মান্য। অর্থাৎ ইহা হইতেই কর্ম্মত্যাগ সিদ্ধ হইল, উপরন্তু উহা সাত্ত্বিক ত্যাগ নামে কথিত হইল। সত্ত্বসমাবিষ্ট (প্রজ্ঞাতে সম্যকরূপে আবিষ্ট), অতএব স্থিতধী হেতু মেধাবী ও ছিন্নসংশয় ব্যক্তিই ত্যাগী। তিনি দুঃখকর কর্ম্মেও দ্বেষ করেন না বা সুখকর কর্ম্মেও আসক্ত হয়েন না। যদি বল যে এমন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও কর্ম্ম করিতেই থাকিবেন, তাহার অর্থ কি ? তাই শুন—দেহধারী ব্যক্তি কর্ম্মসকলকে নিঃশেষরূপে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন না। এই জন্যই যিনি কর্ম্মফল ত্যাগ করেন, তিনিই ত্যাগী অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগী বলিয়া কথিত হয়েন। কল্যাণকর, অকল্যাণকর এবং উভয়মিশ্রিত—এই তিন প্রকার কর্ম্মের ফল অত্যাগী ব্যক্তিগণেরই পরলোকে প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ফলত্যাগীগণের কখনও তাহা হয় না।

হে মহাবাহো ! সাংখ্য এবং বেদান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে এই পাঁচটি কারণ সকল কর্ম্মসম্পাদনের হেতুস্বরূপ, আমা হইতে শুন :—অধিষ্ঠানরূপী দেহ, কর্ত্তারূপী অহং, পৃথক পৃথক করণ বা সাধন প্রণালী, অনেক প্রকার চেষ্টা বা ব্যাপার এবং পঞ্চম দৈবকে জানিবে। মনুষ্যগণ শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা ন্যায্য বা অন্যায্য—যে কোনও কর্ম্মই করে, এই পাঁচটিই তাহার কারণ। এইরূপ ব্যাপার হইলেও যে ব্যক্তি নিরুপাধি সদাশান্ত আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া দেখে, অসংস্কৃত (অবিশুদ্ধ)

বুদ্ধিহেতু সেই দুর্ব্বুদ্ধি তত্ত্বাবধারণে সক্ষম হয় না। যাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই তথা যাঁহার বুদ্ধি আসক্ত হয় না, তিনি এই সমস্ত লোককে হনন করিলেও কিছুই হনন করেন না বা সেই হত্যাপাপের ফলেও বদ্ধ হয়েন না। [এই স্থূল ভূতসমূহ স্থূলাকারে বস্তুবিশেষের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইলেও বিচারসহ তাহা নহে। কারণ, আকাশ বা আকাশরূপী শূন্যই যাহার ভিত্তি-মূল, তাহা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইতে পারে; কিন্তু মূলতঃ অথবা তত্ত্বতঃ ইহার অস্তিত্ব কেবলমাত্র গুণবিকারের ফলস্বরূপ। শুধু সংস্কারবুদ্ধিই, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহাকে রূপে কল্পনা করে এবং নাম আরোপ করে বাসনা দ্বারা। বিচারে অবস্তু—তাই অসৎ! অসৎ সম্পর্কে, বাসনাত্মিকা বুদ্ধি (মন) দ্বারা গ্রাহ্য হইলেও নিশ্চাত্মিকাবুদ্ধি বা প্রজ্ঞাতে প্রতিভাত হয় না। অতএবই অহংকারের উপরিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি, স্থূল ভৌতিকদেহ বধ করিয়াও কিছুই করেন না (লিপ্ত হয়েন না)।]

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা—এই তিনটিই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা—এই তিনটিই কর্ম্মের আশ্রয়। জ্ঞান, কর্ত্তা এবং কর্ম্ম—গুণভেদে তিন প্রকারের। সাংখ্যশাস্ত্রে এবিষয়ে যেরূপ বর্ণিত আছে, সে সকলও শ্রবণ কর। যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থিত সর্ব্বভূতে অবিভক্তভাবে একই অব্যয় বা নিত্যভাব লক্ষিত হয়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জানিও। যে জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহকে নানাভাবে পৃথক পৃথক রূপে অনুভব করে, সেই জ্ঞানকে রাজস জানিও। যেজ্ঞান প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের

বিরোধী, যুক্তিবিরুদ্ধ, অতিতুচ্ছ কোনও এক বিশেষ কার্য্যে "উহাই যাহাকিছু সর্ব্বসার", বোধে আসক্ত হয়, তাহাই তামস নামে পরিচিত। ফলাকাঙ্খাবর্জ্জিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে অনাসক্তভাবে রাগদ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়। কামী ব্যক্তি কর্ত্তৃক অহঙ্কারে বহু পরিশ্রমে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস নামে কথিত হইয়া থাকে। ভাবীফল, অর্থনাশ, হিংসা তথা স্বীয় বলাবল বিবেচনা না করিয়া যে কর্ম্মানুষ্ঠান হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত হয়। কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ তথা ফলাকাঙ্খা হইতে মুক্ত, অনহংকারী, ধৈর্য্য ও উৎসাহশীল, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক বলা হয়। বিষয়ানুরাগী কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসুক, অশুচি, কখনও হর্ষিত আবার কখনও বিষণ্ণ কর্ত্তাকে রাজস বলা হয়। অশান্ত, অসভ্য, অনম্র, বঞ্চক, পরস্বাপহারী, অলস, বিষাদী দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাকে তামস বলা হয়। হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি ও ধৃতির গুণানুসারে তিন প্রকারের পার্থক্য আছে। এবিষয়ের পৃথক পৃথকরূপে আলোচনা সকলই শুন ঃ—হে পার্থ! প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি, কর্ত্তব্য তথা অকর্ত্তব্য, ভয় এবং অভয়, বন্ধ তথা মুক্তি—এই গুলি যে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চিত হইতে পারে সেই বুদ্ধিই সাত্ত্বিক। হে পার্থ! যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্ম তথা অধর্ম্ম, কার্য্য তথা অকার্য্য অযথার্থরূপে জ্ঞাত হয়, সেই বুদ্ধি রাজসী। হে পার্থ! যে বুদ্ধি অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া মানে, সকল বিষয়েই বিপরীত বোধে

—অজ্ঞানাচ্ছন্ন সেই বুদ্ধি তামসী। হে পার্থ! যোগবলে অবিচলিত যে ধৃতির দ্বারা মন, প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ধৃত হয়—সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী। হে পার্থ! পরন্তু যে ধৃতির দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্ম ও অর্থ সকলকে ধারণ করিয়া ফলাকাঙ্খী হয়—সেই ধৃতি রাজসী। হে পার্থ! যাহার দ্বারা স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ এবং মোহ সকলকে অবিবেক হেতু পরিত্যাগ করে না—সেই ধৃতি তামসী। হে ভরতর্ষভ! ইদানীং তিন প্রকারের সুখের বিভাগও শ্রবণ কর। যে অবস্থায় অভ্যাস সাধন যোগে আনন্দ লাভ হয়, যাহা লাভ হইলে দুঃখের অন্ত হয়, যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় পরিণামে অমৃততুল্য, যাহা আত্মনিষ্ঠ হওয়ার ফলে জন্মে—তাহাই সাত্ত্বিক সুখ। বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগ বশতঃ যে সুখ—আগে অমৃততুল্য পরিণামে বিষসদৃশ—তাহাই রাজসিক সুখ নামে পরিচিত। এবং যে সুখ অগ্রে এবং পরিণামেও বুদ্ধির মোহকর, নিদ্রালস্য প্রমাদ হইতে জাত—সেই সুখ তামস নামে খ্যাত। পৃথিবীতে বা স্বর্গে এমন কি দেবগণেতেও এরূপ কোনও সত্ত্বা নাই যাহা প্রকৃতি-জাত এই তিন গুণ হইতে সম্পর্কহীন বা মুক্ত থাকিতে পারে।

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্ম্ম-সমূহ স্বভাবজাত গুণানুসারে বিভক্ত হইয়াছে। চিত্তসংযম, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা, শৌচ, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য—এইগুলিই ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম। পরাক্রম, তেজ,

ধৈর্য্য, কার্য্যদক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখীনতা দান, শাসনক্ষমতা—এই সকলই ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম্ম। কৃষি, গোরক্ষা, বানিজ্য—এইগুলি বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম্ম। এবং সেবাই শূদ্রদিগের স্বভাবজাত কর্ম্ম। নিজ নিজ কর্ম্মাভিমুখে যুক্ত থাকিয়াই মনুষ্যগণ সিদ্ধিলাভ. করে। স্বকর্ম্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে, তাহা শ্রবণ কর। যাহা হইতে প্রাণীগণের কর্ম্মচেষ্টা প্রবৃত্ত হইয়াছে, তথা যদ্দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে—নিজ কর্ম্মদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে (অর্থাৎ মানুষের, ইন্দ্রিয়, ভোগ্যবিষয়ে লালসা না থাকিলে, "তাঁহার নিয়োগে তাঁহার কর্ম্ম মাত্রই করিতেছি" বোধে বন্ধন হয় না)। দোষযুক্ত স্বধর্ম্ম, উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত অন্যের ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতির নিয়োমানুসারে কর্ম্ম করিয়া মানুষ পাপভোগী হয় না। হে কৌন্তেয় স্বভাবজাত কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিতে নাই, যেহেতু সকল কর্ম্মই ধূম্রাবৃত বহ্নির ন্যায় দোষযুক্ত। সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত, সংযতচিত্ত, স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগদ্বারা পরম নিষ্কামতারূপ সিদ্ধিলাভ করেন।

হে কৌন্তেয়! সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়েন, তাহাই আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর—উহাই জ্ঞানের চরম পরিণতি (নিত্য)। বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধৃতিদ্বারা চিত্তসংযম করতঃ শব্দাদি বিষয়সমূহকে ত্যাগ করিয়া রাগ ও দ্বেষ বর্জ্জন পূর্ব্বক, নির্জ্জন দেশ সেবী মিতাহারী হইয়া শরীর

ও মনকে সংযত করতঃ সর্ব্বদা আত্মধ্যানে যুক্ত থাকিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বনে দর্প কাম ক্রোধ, বল, অহংকার এবং পরিগ্রহ (বস্তু সংগ্রহের চেষ্টা) শূন্য হওয়তঃ নির্ম্মম, প্রশান্তচিত্ত সাধক ব্রহ্ম লাভের উপযুক্ত হয়েন। ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তি শোক করেন না বা আকাঙ্খা করেন না। সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া মদ্গদ-চিত্তে পরাভক্তি লাভ করেন। আমি ব্যাপকরূপে এবং সমষ্টিরূপে তত্বতঃ যেরূপ তাহা ভক্তি দ্বারা জানিতে পারেন। অতঃপর আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া তদনন্তর আমাতেই প্রবেশ করেন। সর্ব্বদা সকল কর্ম্ম করিয়াও আমাকে আশ্রয় করতঃ আমার অনুগ্রহে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়েন।

চিত্তদ্বারা সকল কর্ম্ম আমাতে গচ্ছিত রাখিয়া (অর্থাৎ ফলাফল, বলাবল, সুখদুঃখ আমাতে সমর্পণ করতঃ) সমত্ব বুদ্ধিযোগ আশ্রয়ে সতত আমাপরায়ণ হও। আমাপরায়ণ হইয়া আমার অনুগ্রহে সমস্ত সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবে। আর যদি অহংকার বশে না শুন, তবে বিনষ্ট হইবে। যে অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া "যুদ্ধ করিব না" মনে করিতেছ, তোমার এই সংকল্প মিথ্যা। প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবেই (কেন না তুমি ক্ষাত্রবীর)। হে কৌন্তেয় ! মোহবশে যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজাত স্বীয় কর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ হওয়তঃ অবশের ন্যায়ই তাহা করিবে। হে অর্জ্জুন ! মায়াদ্বারা যন্ত্রারূঢ় প্রাণী সকলকে ভ্রমণ করাইয়া জগৎপ্রভু ঈশ্বর সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। হে ভারত ! সর্ব্বোতোভাবে

তাঁহারই শরণ লও, তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে। গুহ্য হইতে গুহ্য জ্ঞান আমা কর্ত্তৃক তোমাকে উক্ত হইল। এইগুলিকে অশেষরূপে পর্য্যালোচনা করতঃ যেমন ইচ্ছা হয় তেমনই কর।

সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরমবাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়জন, সেই হেতুই তোমার হিতকারী উপদেশ দিতেছি ঃ—সর্ব্বদা আমার চিন্তাপরায়ণ, আমার গুণানুবাদ শ্রবণ কীর্ত্তনে আমাতেই অনুরাগী হও; কর্ম্মসকল আমারই জন্য কর এবং ফলাফল আমাতেই অর্পণ কর; আমাকেই নমস্কার কর। তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে তুমি আমাকেই পাইবে; কেন না, তুমি আমার প্রিয়। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর। আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতেই মুক্ত করিব, শোক করিও না। ইহা তপস্যাহীন, ভক্তিহীন, শ্রবণে অনিচ্ছুক এবং যে আমাকে অসূয়া করে—তাহাদিগকে তোমার বলা উচিত নয়। যে ব্যক্তি এই পরম গুহ্য তত্ত্বকথা আমার ভক্তগণ মধ্যে ব্যাখা করিবেন, আমাতে পরম ভক্তি আরোপ করতঃ তিনি আমাকেই পাইবেন সন্দেহ নাই। মনুষ্যগণ মধ্যে সেই গীতা ব্যাখ্যকারী অপেক্ষা কেহ আমার অধিক প্রিয় নাই। তদপেক্ষা অন্য কেহ আমার প্রিয়তরও পৃথিবীতে হইবে না। যিনি আমাদের উভয়ের এই ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন অধ্যায়ন করিবেন সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক আমি জ্ঞান যজ্ঞদ্বারা পূজিত হইয়া

বাঞ্ছাপূর্ণকারী ইষ্ট হইব—ইহাই আমার মত। শ্রদ্ধাবান অসূয়াশূন্য যে ব্যক্তি কেবল মাত্র শ্রবণ করেন, তিনিও মুক্ত হইয়া পুন্যশীলদিগের শুভলোক সকল প্রাপ্ত হয়েন। হে পার্থ! তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিলে ত'? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ বিনষ্ট হইল ত'? অর্জ্জুন বলিলেন—হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইল, প্রজ্ঞা লাভ হইল। নিঃসন্দেহ হইয়া আমি এখন স্থিতধী হইয়াছি। তোমার কথা মতই কার্য্য করিব।

সঞ্জয় বলিলেন—এইরূপে আমি মহাত্মা বাসুদেব এবং পার্থের লোমহর্ষণ অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। বাসুদেবের প্রসাদে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতেই আমি এই গুহ্য যোগবিদ্যা শ্রবণ করিয়াছি। হে রাজন্ (ধৃতরাষ্ট্র) কেশবার্জ্জুনের এই পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ কথা স্মরণ করিতে করিতে মুহুমুহুঃ হৃষ্ট হইতেছি। হে রাজন! হরির সেই অদ্ভুত রূপকেও স্মরণ করিতে করিতে আমার অত্যন্ত অশ্চর্য্য বোধ হইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি। যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং ধনুর্ধারী পার্থ, সেইখানেই শ্রী-বিজয়ভূতি এবং ধ্রুবানীতি (প্রজ্ঞাবাদ)—ইহাই আমার জ্ঞান হইতেছে।

সমাপ্ত